



# আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান

বদলে যাওয়া তুরস্কের ১০০ বছর

মোস্তফা ফরসাল পারভেজ

# আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান

মোস্তুফা ফয়সাল পারভেজ



গার্ডিঘান

পা ব লি কে শ ন



## প্রকাশকের কথা

১৯২৪ সাল। তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর শেষ সম্ভাবনা উসমানি খিলাফতের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছিল মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে এক অন্যরকম নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল বসফরাস প্রণালীর নিয়ন্ত্রক মানুষদের চিন্তা-কাঠামোতে। আধুনিকতার নামে ইসলাম নিধনের এক ঘৃণ্য পথে হেঁটেছিল আতাতুর্ক। তিলেতিলে গড়ে তোলা সালতানাতকে নিমিষেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কল্পনাকেও হার মানিয়ে একে একে মুসলিম চেতনাবোধ মুছে ফেলার আয়োজন হয়েছিল সেখানে। এক ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি তখন তুরস্কের ঈমানদার মানুষগুলো। আতাতুর্ক যেন সাক্ষাৎ ইবলিস হয়ে নেমে এসেছিল ফাতিহ সুলতান মেহমেদের তুরস্কে। তুর্কি মুসলমানদের কেউ তখন ভাবতে পারেনি, কখনো তাদের ভূখণ্ডে আবার উচ্চকণ্ঠে আজান দেওয়া সম্ভব হবে, মুসলিম মেয়েরা আবার হিজাব পড়ে ক্লাসে যেতে পারবে। পাবলিক প্লেসে চিৎকার করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে পারবে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাত্র ১০০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তুরস্ক ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ঈমানদারি, পরিশ্রম, ধৈর্য আর প্রজ্ঞার সমন্বয়ে তুর্কিরা আবার উসমানি ঘোড়া ছোটাতে শুরু করেছে। ইউরোপের বুকের উপরে বিশ্বাসীদের মাথা উঁচু করে চলার এই দারুণ ব্যাপারটা ৫ হাজার ৬১৬ কিলোমিটার দূরের এই আমাদের কাছেও অনেক বেশি প্রেরণার। বিশেষ করে ইসলামি জীবনাদর্শকে যারা বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চায়, তাদের জন্য আজকের তুরস্ক একটা বিরাট শিক্ষণীয় ক্ষেত্র।

তুরস্ক প্রবাসি বাংলাদেশি তরুণ মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ বদলে যাওয়া তুরস্কের বিগত ১০০ বছরের রাজনীতির একটা নির্মোহ বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাসের ধারাবাহিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন— কীভাবে তুরস্ক বদলে গেল, বদলে দিলো। নিজের মতামত উপস্থাপন না করে চলমান ঘটনাপ্রবাহকে সামনে এনে বদলে যাওয়া তুরস্কের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র এঁকেছেন তার ‘আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান : বদলে যাওয়া তুরস্কের ১০০ বছর’ গ্রন্থে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তুরস্কের বদলে যাওয়ার গল্প শুনে আমাদের কী লাভ? এর উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমাদের এই ভূখণ্ডের সমকালীন বাস্তবতায় তুর্কি অধ্যয়ন হয়তো কোনো আলোক রেখার সন্ধান এনে দিতে পারে। নিকষ কালো অন্ধকারে সবাই তো আলো খুঁজে ফিরছে। এই গ্রন্থের পাতায় অনুসন্ধিৎসু চোখ রেখে খানিকটা সময় ধরে আমরাও কিছু খুঁজব ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

## লেখকের কথা

তুরস্ক। একবিংশ শতাব্দিতে বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম আলোচিত দেশ। সারা পৃথিবীর চোখ এখন তুরস্কে। এক নতুন তুরস্ক দেখছে বিশ্ব। ‘ইউরোপের রুগ্ন দেশ’ খ্যাত তুরস্ক এখন আঞ্চলিক রাজনীতির নেতৃত্ব থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম প্রভাবক। সারা পৃথিবীকে তুরস্ক এখন তার নব-উত্থানের গল্প শোনাচ্ছে।

৬৩৬ বছরের গৌরবের অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গত বিংশ শতাব্দিতে তুরস্ক ছিল অনেক বেশি নিস্প্রভ। অথচ, গল্পটা এমন ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর উসমানি সালতানাতকে কবর দিয়ে এক সেক্যুলার তুরস্ক গড়ে তুলেছিল মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। ৬৩৬ বছরের ইসলামি চেতনাকে বসফরাসের তীরে সলিল সমাধি দিতে চেয়েছিল আতাতুর্ক। তবুও অদ্যাবধি তুরস্কে আতাতুর্ক সকল শ্রেণির কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু চাইলেই কি তুরস্কের ঐতিহ্যকে মুছে ফেলা যায়? সেলজুক আর উসমানি সালতানাতের স্মৃতিবিজড়িত তুরস্কের রয়েছে হাজার বছরের ইসলামের ইতিহাস। নতুন তুরস্ক আবার ইসলামি চেতনার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠছে। এ যেন এক নিউ ব্র্যান্ড তার্কি! নিউ লুক তার্কি! এই নিউ ব্র্যান্ড টার্কি গড়তে বেশ কয়েকজন মহানায়ক তাদের জীবন-যৌবনের সবটুকু ব্যয় করেছেন। তুরস্কের ইসলাম রক্ষার সামাজিক আন্দোলনের জনক বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি, আর রাজনীতিতে আদনান মেন্দেরেস, তুর্গেত ওজেল, নাজমুদ্দিন আরবাকান থেকে সর্বশেষ রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান।

১৯২৪ সালের উসমানি খিলাফতের পতন হলো। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ডিইসলামাইজেশনের এক ঘৃণ্য পথ বেছে নিল। একটা একটা করে ইসলামের প্রাণসত্তাকে আঘাত করা হলো। বসফরাসের নদীতে ইসলামি চেতনা, কৃষ্টিকে ভাসিয়ে দেওয়ার আয়োজন করা হলো। গৌরবদ্বীপ্ত উসমানি খিলাফতের চারণভূমি তুরস্কে সেক্যুলারিজমের নামে ধর্মহীনতা গেঁড়ে বসল। ইতিহাসের গতিধারা উলটো শ্রোতের দেখা পেল।

কিন্তু ইসলামের প্রাণসত্তাকে কে, কবে, কখন দাবিয়ে রাখতে পেরেছে? খাঁদের কিনারে দাঁড়িয়ে কোনো এক মুআজ্জিন আজান হাঁকিয়েছে উচ্চকণ্ঠে সাহস ভরে। কেউ না কেউ জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেই। ফিনিক্স পাখির মতো আবার ডানা মেলেছে। যাদের রক্তে উসমানি নেতৃত্ব, তারা কি এভাবে দমে যেতে পারে? না। কক্ষনো না। ক্ষণিকের বিরতি ভেঙে আবার দৌড় শুরু করল উসমানি ঘোড়া। তুরস্কের এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ছুটে বেড়াতে বদিউজ্জামাল নুরসি। জেল, জুলুম, নির্যাতন সবকিছু সহ্য করেও কয়েক দশক ইসলামকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

খিলাফত বিলুপ্তের পরে সর্বপ্রথম রাজনৈতিকভাবে যে মানুষটি তুর্কি জাতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিলেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট তুরস্ককে কক্ষপথে ফিরিয়ে আনার দীর্ঘমেয়াদী সফরের যাত্রা শুরু করেছিলেন,

তিনি হলেন তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দেরেস। তারপরের দৃশ্যপটে প্রফেসর ডক্টর নাজমুদ্দিন আরবাকান। হতাশাগ্রস্ত তর্কিশ জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে নবীণ বিজ্ঞানী নাজমুদ্দিন আরবাকান ঘোষণা দিলেন, ‘একটি ফুল দিয়ে কখনও বসন্ত হয় না, কিন্তু প্রতিটি বসন্ত শুরু হয় একেকটি ফুল দিয়ে।’ তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিল্লিগুরুশ গঠনমূলক ও সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে তর্কিশদের আবারও আশা দেখাল। কিন্তু সামান্য কুদুস প্রোগ্রামের অপরাধে পুনরায় শুরু হয় সামরিক শাসন। নিষিদ্ধ করা হয় আরবাকানের উদ্যোগকে। নতুন উদ্যোগে উসমানি চেতনাকে বুকে নিয়ে এগিয়ে আসা আদনান মেন্দেরেস কিংবা নাজমুদ্দিন আরবাকান— কাউকেই ওরা ন্যূনতম সুযোগ দিতে চায়নি। অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছে। তুর্গেত ওজেলকে বিষক্রিয়ায় হত্যার মাধ্যমে আর নাজমুদ্দিন আরবাকানকে দেশি-বিদেশি শক্তির পোস্ট মডার্ন ক্যু’র মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার পর তুরস্কের ধার্মিক জনগোষ্ঠীর ওপর নেমে আসে নির্যাতন আর লাঞ্ছনার খড়গ। এক হাতে ধর্মীয় স্বাধীনতা, আরেক হাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোর মশাল নিয়ে তুর্কি জাতিকে আবারও বিশ্বরাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে তাবৎ নির্যাতিত মজলুম জনগোষ্ঠীর জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন, তিনি হলেন মুসলিম বিশ্বের অবিসাংবাদিত নেতা রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান। বাহ্যিক রাজনীতিতে তার উদার গণতান্ত্রিক নীতি আর বাস্তব ময়দানে ঐশী চেতনার সাথে উসমানি খিলাফতের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ লড়াইয়ের কাছে হার মেনেছে। ব্যর্থ হয়েছে তাকে হত্যা কিংবা খামিয়ে দেওয়ার সকল ষড়যন্ত্র।

তুরস্কে পিএইচডিরত অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন সময় দেশের অনেকেই তুরস্কের ব্যাপারে জানার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। জাতীয় পত্রিকা, অনলাইন মিডিয়া, ব্লগ কিংবা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে লেখার চেষ্টা করলেও তিন বছর আগে থেকেই এই বইটি লেখার যাত্রা শুরু করেছিলাম। বইটি লেখার ক্ষেত্রে যে মানুষেরা আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আমার প্রিয়তমা স্ত্রী তাসনিমা জাহান সুরাইয়া (নওশিন), আমার ছোটো বোন রুবাইয়া মোস্তারি সাবিহা, প্রকাশক প্রিয় নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের এবং আমার পিএইচডি সুপারভাইজার প্রফেসর ড. মেহমেত আকিফ ওজের (Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER)। তুরস্কে আমার এই চার বছরে যাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত কিংবা সামষ্টিকভাবে বিভিন্ন সময় সহযোগিতা পেয়েছি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে নাজমুদ্দিন আরবাকান ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. জাকারিয়া মিজিরাক (Prof. Dr. Zekeriya Mızırak), আরাকান প্লাটফর্মের চেয়ারম্যান ইউসুফ বালিজি (Yusuf Balci), টিকার ডিপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. বিরল চেতিন (Prof. Dr. Birol Çetin), গাজি ইউনিভার্সিটির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. গঞ্জা বাইরাকতার দুরগুন (Professor Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN), প্রফেসর ড. নেজমি উয়ানিক (Prof. Dr. Necmi Uyanık)—এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও একে পার্টির প্রফেসর ড. ইয়াসিন আকতায় (prof. Dr. Yasin Aktay), সংসদ সদস্য আসুমান এরদোয়ান (Asuman

Erdoğan), বুরহান কায়াতুর্ক (Burhan Kayatürk) অনুর আলেপ বাশায়ার (Onur Alp Başayar), সাদাত পার্টির Hasan Bitmez, তুরস্কের বিভিন্ন এনজিও ও সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে : উদেফের চেয়ারম্যান ড. মেহমেত আলি বোলাত (Dr. Mehmet Ali Bolat), IHH-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সাইদ দেমির (Said Demir), ইফো সভাপতি ড. মুসা বুদাক (Dr Musa Budak), ইয়ে দুনিয়া ভাকফি আংকারা সভাপতি আলি তকুজ (Ali Toköz), বিরলিক ভাকফির আবু বকর তুর্কমেন (Ebubekir Türkmen), আসমা কপরুর সভাপতি হানেফি সিনান (Hanefi Sinan) প্রমুখের সহযোগিতার কথা মনে থাকবে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি, যাদের ভালোবাসা ও দুআতে আমি জীবন সংগ্রামের এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা এই বইটি সাহিত্যের ছোঁয়া কম থাকা আমার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। চেষ্টা করেছি নিজের সীমিত জ্ঞানকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে। পাঠকদের দৃষ্টিতে ভুলত্রুটি প্রতীয়মান হলে অবশ্যই সংশোধনের চেষ্টা করব।

আমার বিশ্বাস, আজকের বাংলাদেশে বাস্তবতায় আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান পাঠ খুব বেশি প্রাসঙ্গিক। পাঠকবৃন্দ তুরস্কের ইতিহাস ও বাস্তবতার সাথে নিজেদের মিলিয়ে আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা করি। সম্ভাব্য করণীয় ঠিক করতে এই পাঠ আপনাকে কিছুটা আলোক রেখা এনে দেবে ইনশাআল্লাহ। তুমুল অঙ্ককারে আলোর রেখা খুঁজে পাওয়াটা যে আজ অনেক বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোস্তুফা ফয়সাল পারভেজ

আংকারা, তুরস্ক

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

## সূচিপত্র

তুরস্কের রাজনীতির আদর্শিক মেরুকরণ	১৫
আতাতুর্কপূর্ব তুরস্ক	১৯
এরতুরুল গাজির উত্থান	২০
উসমানি খিলাফতের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস (১২৯৯-১৫৫৬)	২৩
উসমানি খিলাফতের অধঃপতন (১৫৫৬-১৭৮৯)	৩৫
উসমানি খিলাফতের অধঃপতনের কারণ	৪১
প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের পটভূমি (১২৯৯-১৫৫৬)	৪২
পশ্চিমা আধুনিকীকরণের প্রভাব ও তানজিমাত আন্দোলন	৪২
ইয়াং তুর্কস মুভমেন্ট	৪৫
প্রথম সাংবিধানিক সময়কাল	৪৬
কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস	৪৭
দ্বিতীয় সাংবিধানিক সময়কাল	৪৭
বলকান যুদ্ধ	৪৮
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও উসমানি খিলাফত	৫০
চানাকালে যুদ্ধ	৫১
সেভার্স চুক্তি	৫৩
আরবদের বিদ্রোহ	৫৫
মরুভূমির বাঘ ফখরুদ্দিন পাশার বীরত্ব	৫৫
মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের উত্থান	৫৮
লুজান চুক্তি	৫৯
খিলাফতের সমাপ্তি	৬০
উসমানি খিলাফতের ঢেউ লেগেছিল ভারতীয় উপমহাদেশেও	৬০
প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের বাস্তবতা	৬২
আতাতুর্কের একদলীয় শাসনব্যবস্থা	৬৪
একমাত্র রাজনৈতিক দল সিএইচপি'র যাত্রা	৬৪
আতাতুর্কের সংস্কারসমূহ	৬৫

বিরোধীদের যাত্রা ও বিলুপ্তি	৬৬
কামালিজম যখন মতবাদ	৬৭
কুর্দিস নেতাদের ফাঁসি	৬৭
আতাতুর্কের একদলীয় শাসনামলের পররাষ্ট্রনীতি	৬৭
আতাতুর্ক-ইনুন্নর দ্বন্দ্ব	৬৮
আতাতুর্কের ইত্তেকাল	৬৮
ইসমত ইনুন্নর পুনরায় ক্ষমতায়ন	৬৮
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	৭১
আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের যাত্রা	৭১
তুরস্কের রাজনীতিতে সিএইচপিএর অবস্থান	৭২
বিভিন্ন নির্বাচনে সিএইচপিএর ফলাফল	৭২
বিভিন্ন সময়ে সিএইচপিএর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ	৭৩
ডেমোক্রেটিক পার্টির শাসনামল	৭৭
ডেমোক্রেটিক পার্টির যাত্রা	৭৭
আদনান মেন্দেরেসের সংস্কারসমূহ	৭৮
ডেমোক্রেটিক পার্টির পররাষ্ট্রনীতি	৭৯
সেনা কুয় ও আদনান মেন্দেরেসের ফাঁসি	৮০
কুয় ও সেনা নিয়ন্ত্রিত ভগুর রাজনীতি (১৯৬০-১৯৮৩)	৮২
তুরস্কের সেনা নিয়ন্ত্রিত সাংবিধানিক কোর্ট	৮২
সেনা সরকারের প্রধান জেনারেল জামাল গুরসেলের পরিচয়	৮৩
ইনুন্নর কোয়ালিশন সরকার	৮৩
আদালত পার্টির উত্থান	৮৪
জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট	৮৫
দ্বিতীয় সেনা কুয় এবং সেনা নিয়ন্ত্রিত অস্থায়ী সরকার	৮৫
ইসলামপন্থীদের প্রথম কোয়ালিশন সরকার	৮৬
একের পর এক কোয়ালিশন সরকার	৮৭
১৯৭৪ সাইপ্রাস অভিযান	৮৮
অস্থির দেশ, সেনাবাহিনীর সুযোগ গ্রহণ	৮৮
১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০-এর কুয়	৮৯
গ্রেফতার ও নির্যাতন	৯০



জেনারেল কেনান এভরেন	৯১
গণভোট ও সাংবিধানিক সংস্কার	৯১
তুর্গেত ওজেলের শাসনামল (১৯৮৩-৯৩)	৯৩
সীমিত গণতন্ত্রের যাত্রা	৯৩
তুর্গেত ওজেলের আনাভাতান পার্টির উত্থান	৯৪
রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার	৯৫
তুর্গেত ওজেলের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রেসিডেন্ট	৯৫
আনাভাতান পার্টির পরাজয় এবং তুর্গেত ওজেলের মৃত্যু	৯৭
তুর্গেত ওজেলের পররাষ্ট্রনীতি	৯৭
সুলাইমান দেমিরেল ও তানসু চিলারের কোয়ালিশন	৯৮
তুরস্ক-ইজরাইল সামরিক চুক্তি	৯৮
ইসলামপন্থীদের উত্থান এবং পোস্ট মডার্ন ক্যু (১৯৯১-২০০২)	৯৯
স্থানীয় নির্বাচনে রেফাহ পার্টির বিজয়	৯৯
জাতীয় নির্বাচনে রেফাহ পার্টির ঐতিহাসিক বিজয়	১০০
পোস্ট মডার্ন ক্যু	১০২
রেফাহ পার্টি বন্ধ এবং ফজিলত পার্টির যাত্রা	১০৮
ডেমোক্রেটিক বাম-জাতীয়তাবাদী-আনাভাতান জোট	১০৮
ফজিলত পার্টি বন্ধ ঘোষণা এবং সাদাত পার্টির যাত্রা	১০৯
ক্যু'কারীদের ২১ বছর পর শাস্তি	১১০
তুরস্কের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল	১১০
বিভিন্ন সময় সাদাত পার্টির অর্জিত ভোট ও নির্বাচনী ফলাফল	১১২
সাদাত পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো	১১৩
সাদাত পার্টির দলীয় প্রেসিডেন্টদের পরিচিতি	১১৫
সাদাত পার্টির ভোট কমে যাওয়ার কারণ	১১৮
সাদাত পার্টির ভোটেই কি একে পার্টি ক্ষমতায় আসে	১১৯
লিবারাল প্ল্যাটফর্মের উত্থান (২০০২-২০১৮)	১২০
নতুন পার্টি গঠনের প্রেক্ষাপট	১২০
একে পার্টির প্রতিষ্ঠা	১২২
২০০২-এর নির্বাচনে একেপির বিজয়	১২৪

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এরদোয়ান	১২৫
নির্বাচনে একে পার্টির সফলতা	১২৬
একে পার্টির প্রথম ব্যর্থতা	১২৮
পুনরায় নির্বাচন	১২৯
২০১৭ সালের রেফারেন্ডাম	১২৯
প্রথম প্রেসিডেন্টসিয়াল নির্বাচনী ফলাফল	১৩০
ভোটের ফলাফল	১৩০
এরদোয়ান সরকার ও ডিপ স্টেটের দ্বন্দ্ব	১৩১
আব্দুল্লাহ গুলের পরিবর্তে দাউদ উলু	১৪০
দাউদ উলুর পরিবর্তে বিনালি ইলদিরিম	১৪১
বিনালি ইলদিরিম	১৪১
একে পার্টির সংগঠন ও রাজনীতি	১৪২
একে পার্টির নির্বাচনী কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি	১৪২
একে পার্টির বিভিন্ন সভাপতিদের সময়কাল	১৪৯
একে পার্টির রাজনৈতিক দর্শন	১৪৯
তুরস্কের মৌলিক পরিবর্তনে একে পার্টির মডেল	১৫০
তুরস্কের গণতন্ত্রকীকরণে একে পার্টির ভূমিকা	১৫০
সেনা-সিভিল সম্পর্ক তৈরিতে একে পার্টির ভূমিকা	১৫৩
সেনা-সিভিল সম্পর্ক তৈরিতে একে পার্টির ভূমিকা	১৫৫
একে পার্টি ও তুরস্কের অর্থনীতি	১৫৬
একে পার্টি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৫৮
একে পার্টি ও স্বাস্থ্যখাত	১৫৯
একে পার্টি ও শিক্ষা ব্যবস্থা	১৬০
একে পার্টি ও শিল্প-কলকারখানা	১৬২
একে পার্টি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা	১৬৪
শরণার্থী আন্দোলন ও একে পার্টি	১৬৫
একে পার্টির সাথে বিভিন্ন দেশের ইসলামি দলগুলোর সম্পর্ক	১৬৬
একেপি পার্টি ও তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতি	১৬৭
একে পার্টি, তুরস্ক ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সদস্য ইস্যু	১৮৩
একে পার্টির সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	১৮৫

তুরস্কে বাম সেক্যুলার শক্তির রাজনীতিতে টিকে থাকার কারণ	১৯৪
শত বছরের তুরস্কের রাজনীতির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ	১৯৬
গাজি মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক	১৯৬
আদনান মেন্ডেরেস	১৯৮
অরাজনৈতিক ধর্মীয় নেতা সাইয়েদ বদিউজ্জামান নূরসি	১৯৯
সুলাইমান দেমিরেল	২০৩
তুর্গেত ওজেল	২০৫
প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন আরবাকান	২০৭
রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান	২১০
ড. আব্দুল্লাহ গুল	২১৪
প্রফেসর ড. আহমেদ দাউদ উলু	২১৬
ফেতুল্লাহ গুলেন	২১৭
তুরস্কের শত বছরের কয়েকটি আলোচিত ইস্যু	২২১
কুর্দিশ ইস্যু ও তুরস্ক	২২১
আর্মেনীয়া ইস্যু ও তুরস্ক	২২৯
হিজাব আন্দোলন ও তুরস্ক	২৩৪
(উপসংহার) শত বছরের তুরস্ক : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	২৪৩

## তুরস্কের রাজনীতির আদর্শিক মেরুকরণ

একটি রাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার ঐতিহাসিক ভিত্তির মাধ্যমে। আধুনিক তুরস্কের এই জাতীয় ভিত্তিটি রচিত হয়েছে অটোমান সাম্রাজ্য এবং প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের জাতি রাষ্ট্র গঠনের দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। তবে তুরস্কের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এই রাষ্ট্রের পরিচয় বিবেচনা করা হয় অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ ১০০ বছর থেকে। ১৯০৪ সালে তুরস্কের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী লেখক ইউসুফ আকচুরা *uc terzi siyaset* নামে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করে, যেখানে তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের জন্য তিনটি মৌলিক আদর্শিকে চিহ্নিত করেছেন; উসমানিজম, ইসলামিজম ও তুর্কিজম। তার মতে এই তিনটি আদর্শের ওপরই প্রজাতান্ত্রিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উসমানি খিলাফতের শেষ দিকে খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলিম-অমুসলিম জনগণকে উসমানি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেই কাজ করা হতো। প্রথম তানজিমাত বা সংস্কার আন্দোলনের (১৮৩৯-১৮৭৬) মাধ্যমে এই বার্তাটিই জনগণের মাঝে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খিলাফতের বিভিন্ন অংশে ক্রমাগত বিদ্রোহ বেড়ে গেলে জনগণকে পুনরায় ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল খিলাফত অক্ষুণ্ণ রাখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসময় মুসলমানদের মধ্যে তর্কিশ জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

ফলে ইসলামি আদর্শের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়। সে সময় দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ; যা বিকশিত হয় লেখক ইউসুফ আকচুরার মাধ্যমে এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ; যার বিকাশ ঘটে লেখক জিয়া গোকলাপের মাধ্যমে। এই তর্কিশ জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক তুরস্কের জন্ম হয়।

প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে আদর্শিক অবস্থানের ভিত্তিতে মোটাদাগে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সেক্যুলারিজম
২. ইসলামিজম
৩. লিবারেলিজম
৪. জাতীয়তাবাদ।

উপরোক্ত চারটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের রাজনৈতিক দলগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায় :

তবে তুরস্কের বিখ্যাত লেখক ইদ্রিস কুচুক ওমের তুরস্কের রাজনৈতিক দলগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মতে রাজনৈতিক দলগুলো মূলত বাম ও ডানপন্থী আদর্শে বিভক্ত।

ডানপন্থী	বামপন্থী
১. মিল্লি নিজাম (১৯৭০)	১. আতাতুর্কের সিএইসপি (১৯২৩)
২. মিল্লি সালামত (১৯৭২)	২. হাক্কজি পার্টি (১৯৮৩)
৩. রেফাহ পার্টি (১৯৮৩)	৩. ডেমোক্রটিক বাম দল (১৯৮৩)
৪. ফজিলত পার্টি (১৯৯৮)	৪. সোসালিস্ট পার্টি (১৯৮৩)
৫. সাদাত পার্টি (২০০১)	৫. বাম আদর্শে বিশ্বাসী কুর্দিশ জাতীয়তাবাদী এইচডিপি (২০১২)
৬. এরদোয়ানের একে পার্টি (২০০১)	
৭. আদনান মেন্ডেরেসের ডেমোক্রটিক পার্টি (১৯৪৬)	
৮. সুলাইমান দেমিরেলের আদালত পার্টি (১৯৬১)	
৯. তুর্গেত ওজেলের মাদারল্যান্ড পার্টি (১৯৮৩)	
১০. দুউরু ইওল পার্টি (১৯৮৩)	

ইদ্রিস কুচুক ওমেরের ডান ও বামপন্থী আদর্শে বিভক্তির চেয়েও বাস্তবে তুরস্কের রাজনীতিতে উপরোল্লিখিত চার ধরনের আদর্শই বিভিন্ন দলের ওপর বেশি প্রভাব রাখছে। কিছু দলের ওপর ইসলাম ও সেক্যুলারিজম এককভাবে প্রভাব রাখলেও বাকি দলগুলোর ওপর মিশ্র প্রভাব বজায় রেখেছে। তবে সকল দলের কমন আদর্শের নাম হলো জাতীয়তাবাদ।

তুরস্কের সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল সিএইচপিকে সেক্যুলারিস্ট জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা অভিহিত করে থাকেন। সেক্যুলারিস্ট জাতীয়তাবাদকে অনেকে আবার কামাল আতাতুর্কের কামালিজম বা কামালতত্ত্ব হিসেবেও উল্লেখ করেন। গত ৯৫ বছর ধরে তারা তুরস্কের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস এবং উসমানি চেতনার বিপরীত মতাদর্শ নিয়ে কাজ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য জনতার প্রতিনিধিত্বও করেছে। আতাতুর্কের কটর সেক্যুলার আদর্শ থেকে বেরিয়ে আদনান মেন্ডেরেস প্রথম সেক্যুলারিস্ট লিবারাল রাজনীতির প্রবর্তন করেন। আদনান মেন্ডেরেসের পর সুলাইমান দেমিরেলের আদালত পার্টি ও দুউরু ইওল পার্টি, তুর্গেত ওজেলের মাদারল্যান্ড পার্টি এই আদর্শকে সামনে নিয়ে দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছে। যদিও রাজনীতিতে আদর্শের চেয়ে এদের ব্যক্তি প্রভাবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল।



## আতাতুর্কপূর্ব তুরস্ক

মুসলমানদের সে সময়টা ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীনতার ঘন কুয়াশায় নিমজ্জিত। অভিভাবকহীন মুসলিম বিশ্ব তখন হতাশার গহীন অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিলুপ্তির প্রহর গুনছিল এক সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আভিজাত্যে গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দানকারী স্পেনের পরাক্রমশালী ইসলামি সাম্রাজ্য। যৌবনের সব জৌলুশ হারিয়ে বয়সের ভাঁড়ে নুইয়ে পরেছিল বাগদাদের আব্বাসি খিলাফত। সীমাহীন বিলাসিতা আর আরাম-আয়েশে হারিয়ে ফেলেছিল দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। মুসলিম উম্মাহর নব উত্থানের স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে আবির্ভূত হওয়া সেলজুক সাম্রাজ্যও তখন শক্তি হারিয়ে কেবল অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত। অপরদিকে চেংগিজ খানের উত্তরসূরি হিংস্র মঙ্গোল বাহিনী প্রতিটি মুসলিম জনপদে খুন, লুণ্ঠন আর হত্যাযজ্ঞের পৈশাচিক খেলায় মত্ত। এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে কেউ ভাবেনি আনাতোলিয়ার এক অজ্ঞাত যাযাবর জাতি মুসলিম বিশ্বে নতুন করে ঝান্ডা উড়াবে এবং সাড়ে ছয় শতাব্দী ধরে পৃথিবীর তিন মহাদেশকে একসঙ্গে নেতৃত্ব দেবে। খোরাসান, আর্মেনিয়ায় গড়ে উঠা কায়ি গোত্র নামক উরগুজ তুর্কিদের এক বংশ খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতনের পর দলনেতা সুলাইমান শাহের নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গোত্রটি সুলাইমান শাহের পর তার পুত্র এরতুরুল গাজি এবং নাতি উসমান খানের নেতৃত্বে ১২৮৮ সালে তুরস্কের বিলেজিক প্রদেশের সউত (soğut) থেকে শুরু করে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য। এটাই ইতিহাসে উসমানি খিলাফত বা অটোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিকদের মতে, আব্বাসীয় খিলাফতের শেষ সময়ের দিকে যে বছর হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করেছিল, সে বছরই (১২৫৮ সালে) তুর্ক কায়ি গোত্রের নেতা এরতুরুল গাজির ঘরে জন্ম নিয়েছিল উসমানি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান গাজি। তিনিই পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিন মহাদেশব্যাপী উসমানি খিলাফতের; যা ১২৮৮ সাল থেকে শুরু হয়ে শেষ অবধি ৩৭ জন খলিফার দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রায় ৬৩৬ বছর পর ১৯২৪ সালে শেষ খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদের সময় কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে আধুনিক তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের যাত্রার মাধ্যমে এই উসমানি সালতানাতের সমাপ্তি ঘটে।

### এরতুরুল গাজির উত্থান

১২ শত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। তখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বয়স নয়শো বছর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল, যা বর্তমানে ইস্তানবুল নামে পরিচিত।

স্বাভাবিকভাবেই অতীতের জৌলুশ হারিয়ে বার্ষিক্যের দুর্বলতায় ভুগছিল ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেওয়া এই সাম্রাজ্য। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে ছিল সেলজুক সাম্রাজ্য। তবে মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিজ খানের আক্রমণে সেলজুকদের অবস্থাও বেশ নাজুক হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোজাদাঘের যুদ্ধে মোঙ্গলদের কাছে চূড়ান্ত পরাজয়ের মাধ্যমে সেলজুকরা তাদের বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তবে মোঙ্গলদের সেলজুক শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই তাদের থেকে কেবল বার্ষিক কর নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকত।

একদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দুর্বলতা এবং সেলজুকদের পরাজয়, অন্যদিকে মোঙ্গলদের সুশৃঙ্খল কোনো শাসনব্যবস্থা না থাকায় এশিয়া মাইনরে এক ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সেলজুক ও বাইজেন্টাইন সীমান্তবর্তী এলাকায় বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণের লোকের বসবাস ছিল। এই অঞ্চলে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই চলে। তাই পুরো এলাকাটিকে বিভিন্ন ছোটো ছোটো গোত্রে বিভক্ত করে একেক অংশ একেক নেতা নিয়ন্ত্রণ করত। এমনই একটি গোত্রের নেতা ছিলেন এরতুরুল গাজি। তিনিই ছিলেন ভবিষ্যৎ উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান গাজির বাবা। পুত্র উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেও মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এরতুরুল গাজি নিজেই।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তুরস্কের নতুন প্রজন্মকে আতাতুর্কের সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের হাজার বছরের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে সিরিয়ালের মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসে। এজন্য বিশাল বাজেটের যে টিভি প্রোগ্রামগুলো সরকার শুরু করে, ‘দিরিলিস এরতুরুল’ হলো তার প্রথম সফল প্রজেক্ট। এটি তুরস্কের নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস সচেতন করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। তর্কিশ শব্দ Diriliş-এর ইংরেজি অর্থ Resurrection বা Rebirth, যার বাংলা অর্থ-পুনরুত্থান। সেলজুক সাম্রাজ্যের পতনের পর এরতুরুল নতুন করে তার জয়যাত্রা শুরু করেছিল, এজন্যই তাকে ঐতিহাসিকরা *দিরিলিস* হিসেবে অবিহিত করে থাকেন। আর তাঁর বিজয়াভিযানে ইসলামকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তাঁর নামের সাথে গাজি যোগ করা হয়।

আনুমানিক ১১৯১-১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে তৎকালীন আনাতোলিয়ার আহলাত শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কায়ি গোত্রের নেতা সুলাইয়মান শাহের মৃত্যুর পর এরতুরুল গাজি দলপতি হন। ১২২২-১২৩০ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে সেলজুক সম্রাট আলাউদ্দিন কায়কোবাদের সাথে খ্রিস্টের ইজনিক সম্রাট তৃতীয় ইওয়ানিসের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে এরতুরুল ৩৪০ জন যোদ্ধা নিয়ে সম্রাট আলাউদ্দিন কায়কোবাদকে সহযোগিতা করেন। তার সহযোগিতায় সম্রাট যুদ্ধে বিজয়ী হন। যুদ্ধের পর সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ এরতুরুলকে কিছু জমি প্রদান করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেন। তবে সুলতান এমন এক স্থানে তাকে জায়গা দেন, যার এক পাশে ছিল সেলজুক সাম্রাজ্য, অপর পাশে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য।

এই স্থানটি বর্তমান আনকারা এবং এসকিশেহির প্রদেশের নিকটবর্তী সউত অঞ্চলে অবস্থিত। তবে *দিরিলিস এরতুরুল* সিরিয়ালের পরিচালক ঐতিহাসিক মেহমেদ বুজদারের মতে, এরতুরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কায়ি গোত্রের অন্যতম যোদ্ধা দোয়ান খ্রিষ্টান সৈন্যদের অতর্কিত হামলায় নিহত হয়। এই ঘটনার সময় সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ তখন এরতুরুলের এলাকায় ছদ্মবেশী ব্যবসায়ী হিসেবে আতিথিয়তায় ছিলেন। এরতুরুল তাঁর বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এরতুরুল এমন এক সময় যুদ্ধে বের হন, যখন তার ঘরে অসুস্থ গর্ভবতী স্ত্রী হালিমা খাতুন তাঁর দ্বিতীয় সন্তান সাবজি বের প্রসব বেদনায় ভুগছিলেন। অসুস্থ স্ত্রীকে ঘরে রেখে রোমান আঞ্চলিক গভর্নরের সাথে ভয়ংকর যুদ্ধ নেমে পড়েন। ভয়ংকর এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে সুলতান আলাউদ্দিন ব্যবসায়ী ছদ্মবেশেই এরতুরুলের পক্ষে যুদ্ধে নেমে পড়েন। যুদ্ধে এরতুরুল বিজয়ী হন। সুলতান আলাউদ্দিন এই ঘটনার পর এরতুরুলকে রাষ্ট্রের সউত অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতা (উচ বে) হিসেবে ঘোষণা করেন।

১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিজ খান সেলজুক সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। একদিকে বাইজেন্টাইনদের ক্রমাগত আক্রমণ, অপরদিকে নতুন করে মোঙ্গলদের আগ্রাসন— এই দুই পক্ষকে সামলাতে গিয়ে সেলজুক সাম্রাজ্য প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। ১২৩১ সালের পর মোঙ্গলদের ক্রমাগত আক্রমণ সেলজুক সুলতানকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে। অল্প সময়ের মধ্যে চেঙ্গিজ খানের সৈন্যরা সেলজুক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু কনিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ফলে সেলজুকদের তাদের আদেশের দাস বানিয়ে ফেলে। চেঙ্গিজ খান ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম ভয়ংকর সমরনায়ক। চীন থেকেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা ও কূটনীতির মৌলিক শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম অভিযানেই জিন রাজবংশকে পরাজিত করেন। তারপর একের পর এক দখল করেন উত্তর চীনের জিন রাজ্য, পারস্যের খ্যারিজমীয় সাম্রাজ্য এবং ইউরেশিয়ার কিছু অংশসহ বিভিন্ন এলাকা। মোঙ্গল সাম্রাজ্য যে সমস্ত স্থানগুলো দখল করেছিল, তার আধুনিক নাম হলো : গণচীন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, মলদোভা, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং কুয়েত। চেঙ্গিজ খান ১২২৭ সালে মারা যাওয়ার পর তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণ প্রায় ১৫০ বছর ধরে মোঙ্গল সাম্রাজ্যে রাজত্ব করেছিল।

১২৩৬ সালে আলাউদ্দিন কায়কোবাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াস উদ্দিন কায় খসরু কনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদকে তাঁরই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ কর্মকর্তা আমির সাদেত্তিন কোপেক বিষপানে হত্যা করে। পরবর্তী সুলতানের নির্দেশে আমির সাদেত্তিন কোপেককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এরতুরুলের বিয়ে হয় সেলজুক সাম্রাজ্যের শাহজাদা নোমানের কন্যা হালিমা খাতুনের সাথে। এরতুরুল তিন সন্তানের জনক ছিলেন। তারা হলেন— গুনদুজ আলপ, সাভজি বেয় এবং উসমান গাজি। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এরতুরুলের ঘরে জন্ম নেয় তৃতীয় সন্তান উসমান। এরতুরুলের তৃতীয় সন্তান উসমানের নামানুসারে

তুর্কি বাদশাদের উসমানীয় সুলতান বা অটোমান সুলতান বলা হয়ে থাকে। ১২৮৭ সালে এরতুরুল গাজি মারা যায়। তখন উসমান খানের বয়স ছিল ত্রিশ বছর। সেলজুক সুলতান তখন উসমান খানকেই এরতুরুলের স্থলাভিষিক্ত করেন।

### উসমানি খিলাফতের গৌরবজ্জল ইতিহাস (১২৯৯-১৫৫৬)

উসমানি খিলাফতের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মোট দশজন সুলতান ক্ষমতায় ছিলেন। উসমান গাজির ছোট্ট সউদ থেকে যাত্রা শুরু করে ২৫৭ বছরে খিলাফত তিন মহাদেশে ছড়িয়ে পরে। গৌরবজ্জল ইতিহাসের এই সময়টুকু সংক্ষেপে তুলে ধরা সত্যিই অনেক কঠিন হলেও বর্তমান তুরস্ককে অনুধাবন করার জন্য সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

**সুলতান উসমান গাজি :** ইসলামি স্বর্ণযুগের প্রাণকেন্দ্র, জ্ঞানের নগরী, সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগর হিসেবে খ্যাত আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ তখন পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য হারিয়ে সামরিক ও নৈতিক শক্তিতে বেশ দুর্বল। ভোগ বিলাসে মত্ত ও নখদস্তবিহীন খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহর হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল বাগদাদ। আব্বাসি খিলাফতের এই ক্রান্তিলগ্নে ১২৫৮ সালে রক্ত পিপাসু হালাকু খান কর্তৃক আক্রান্ত হয় বাগদাদ। সীমাহীন হিংস্রতায় প্রাণ হারায় প্রায় দশ লাখ মুসলমান। এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়েই পতন ঘটে মুসলমানদের গৌরবান্বিত দীর্ঘ পাঁচশত বছরের আব্বাসি খিলাফতের। মুসলিম বিশ্বের এহেন কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই আনাতোলিয়ার সউত অঞ্চলের তুর্ক কায়ি গোত্রের প্রধান এরতুরুল গাজির ঘরে জন্ম নেন উসমান খান। ১২৮৮ সালে বাবা এরতুরুল গাজির মৃত্যুর পর উসমান তার স্থলাভিষিক্ত হন। উসমান খানের যোগ্যতার দরুন সুলতান আকৃষ্ট হন এবং তাকে নিজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন। সেইসঙ্গে নিজ কন্যাকেও তাঁর হাতে তুলে দেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদোন্নতি পান। মোঙ্গলদের সাথে এক যুদ্ধে সুলতান গিয়াস উদ্দিন কায় খসরু (২য়) নিহত হয়। ১২৯৯ সালে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক উসমান খানকেই সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে কোনিয়ার নতুন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর মধ্য দিয়েই ১০৭৭ সালে ইসরাইল ইবনে সালজুকের বংশধরদের মাধ্যমে শুরু হওয়া সেলজুক সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় উসমানীয় সাম্রাজ্যের যাত্রা। ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সকল দিক দিয়েই জৌলুসপূর্ণ সাম্রাজ্য ছিল এই উসমানীয় খিলাফত। ৩৪০ জন সৈন্য নিয়ে যে সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটেছিল, সময়ের ব্যবধানে সেই সাম্রাজ্যটিই এতটা প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল যে, ইউরোপের দাপ্তিক সম্রাটরা পর্যন্ত তার কাছে মস্তক অবনতচিন্তে কর ও উপঢৌকন দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সে সময় এশিয়ায় খ্রিষ্টানরা বুরসা, নিকাইয়া এবং নিকোমেডিয়া এই তিন শহরকে শাসন করত। উসমান ১২৯৯ সালে প্রথমে খ্রিষ্টানদের কারাজিহিসার দুর্গ এবং বর্তমান বুরসা প্রদেশের

ইয়েনিসেহির জেলা বিজয় করে সেখানে উসমানি খিলাফতের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩০১ সালে উসমান গ্রিসের নিকাইয়া দখল করেন। পরবর্তী সময়ে ১৩০২ সালে গ্রিসের রাজা উসমানকে পুনরায় আক্রমণ করলে উসমান তাকে পরাজিত করে খ্রিষ্টান শাসিত গ্রিসের এশীয় অঞ্চল তথা নিকোমেডিয়া বিজয় করে নেন। ১৩০৮ সালের ২৪ অক্টোবরে উসমান বাইজান্টাইনদের এক সময়ের রাজধানী ইপহেসুস জয় করেন, যা বর্তমানে তুরস্কের ইজমির শহরে অবস্থিত। এ ছাড়া সাকারিয়া নদীর পশ্চিমাঞ্চল, এসকেসেহিরের দক্ষিণ ভাগ, অলিম্পাস পর্বত ও মারমারা সাগরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তিনি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। উসমান তার রাজ্যের খ্রিষ্টান নাগরিক এবং প্রতিবেশি দুর্গসমূহের খ্রিষ্টান সেনাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। ফলে সে সময় গ্রিস রাজ্যের অনেক সৈনিক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। অলিম্পাস পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত বুরসা ছিল বেশ সুরক্ষিত এক নগরী। ১৩২০ সালে পুত্র ওরহান তার সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩২৬ সালে সেনাপ্রধান ওরহানের নেতৃত্বে বুরসা জয় করা হয়।

বুরসা বিজয়ের এই বছরেই টানা ৩৮ বছর শাসনামলের ইতি ঘটিয়ে উসমানি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান গাজি মৃত্যুবরণ করেন। বুরসা নগরীতেই তাকে কবরস্থ করা হয়। ৩৮ বছর আগে যিনি সাধারণ একজন গোত্রপ্রধান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতা বলে ছোট্ট একটা গোত্রকে এই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। ইতিহাসের এক নয়াপাঠ শুরু হয়েছিল। উসমান একটা গোত্রের যাত্রা শুরু করেছিলেন, আর পুত্র ওরহান তা রাষ্ট্রে রূপ দেন এবং পৌত্র মুরাদ তা একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

**সুলতান ওরহান গাজি :** উসমান বিভিন্ন শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে চারপাশে এনে একত্র করেছিলেন। আর ওরহান তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে কাজে লাগিয়েছিলেন। ইউরোপের ভূখণ্ড বিজয়ের প্রথম যাত্রাকারী ওরহান গাজি ১২৮১ সালে বিলেজিক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ১৩২৬ সালে ওরহান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। উসমানের সময় কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। ওরহান সেনাবাহিনীকে একটি নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত করেন। ওরহানের সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল ১৩২৬ সালে বুরসা বিজয়। খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৩২৯ সালের ১০-১১ জুন গ্রিসের রাজা তৃতীয় এড্রোনিকাস ওরহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ইস্তানবুলের পর দ্বিতীয় রাজধানী ছিল নিকাইয়া। নিকাইয়া বুরসা প্রদেশের ইজনিক জেলা হিসেবে পরিচিত। ১৩৩১ সালে সম্রাট ওরহান গাজি নিকাইয়া দুর্গ বিজয় করে নিকোমেদিয়ার দিকে অগ্রসর হন। নিকোমেদিয়া বর্তমানে কোজায়েলি প্রদেশের ইজমিত হিসেবে পরিচিত। ওরহানের বড়ো ছেলে শাহজাদা সুলাইমান কিছুদিন অবরোধ করে রাখার পর তা জয় করে নেয়। ১৩৩৮ সালে ওরহানের নির্দেশে শাহজাদা সুলাইমান তৎকালীন কনস্টান্টিনোপলের নিকটবর্তী স্কুটারি এলাকা জয় করেন, যা বর্তমানে ইস্তানবুল প্রদেশের বসফোরাসের নিকটবর্তী উসকুদার জেলা হিসেবে পরিচিত। ১৩৪৫ সালে ওরহান গাজি কারেসি



বা বর্তমানের বালিকসেহির প্রদেশ জয় করেন। ১৩৪৫ সালেই ওরহান ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে সম্রাট কাটাকুজিনকে সহযোগিতা করেন। ওরহানের সহযোগিতায় কাটাকুজিন কৃষ্ণসাগরের উপকূল অঞ্চল ও থ্রেস (রোমানিয়া) জয় করে। কাটাকুজিন খুশি হয়ে নিজের মেয়ে থিওডরাকে সম্রাট ওরহানের সাথে বিবাহ দেওয়ার মত প্রকাশ করে। ১৩৪৬ আলে উসকুদারে তাদের জমজমাট বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে অটোমানরা ইউরোপে আত্মীয়তার সূত্রে প্রবেশ করে। ১৩৫৩ সালে শাহজাদা সুলাইমান কাটাকুজিনের সহযোগিতায় থ্রেস বা রোমানিয়ার একটি দুর্গ জয় করেন। ১৩৫৬ সালে অটোমানরা গ্রিকদের গ্যালিপলি (যা বর্তমানে তুরস্কের চানাকালে প্রদেশ) জয় করার মধ্য দিয়ে ইউরোপে তাদের বিজয় যাত্রা শুরু করে।

১৩৬২ সালে সুলতান ওরহান গাজি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। ওরহান ক্ষমতার পারশ্বে বুরসা, সউত ও এসকিশেহিরের কিছু অংশের মালিক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তার ৩৩ বছরের শাসনামলে তিনি রাজ্যকে সামান্য অংশ থেকে বিস্তৃত করে বালিকসেহির, চানাকালে, ইজনিক, বেরগামা, ইজমিত, বলু এবং আংকারা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ঐতিহাসিকদের মতে ওরহান গাজি পঁচানব্বই হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ডের সম্রাট ছিলেন।

**সুলতান প্রথম মুরাদ :** দাদার শক্তিশালী গোত্র এবং পিতার রাষ্ট্রকে যিনি এক মহান সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, তিনি হলেন অটোমান সাম্রাজ্যের ইউরোপ বিজয়ের মহানায়ক সম্রাট প্রথম মুরাদ। ১৩৫৯ সালে পিতা ওরহানের মৃত্যুর পর মুরাদ উসমানি খিলাফতের তৃতীয় সম্রাট হিসেবে ক্ষমতায় বসেন। ১৩২৬ সালের ২৯ জুন বুরসায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বশিক্ষিত মুরাদ প্রতিভার গুণে হয়ে উঠেছিলেন বিচক্ষণ শাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গড়েছিলেন সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালী কাঠামো। সাম্রাজ্যকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বলকান দ্বীপপুঞ্জের সর্বশেষ সীমানা পর্যন্ত। যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনায়ক হলেও সামরিক আকাঙ্ক্ষাকে পাশে রেখে ইসলামের উদারনৈতিক ভাবনা ও সহনশীল নীতিকে মুরাদ তার শাসননীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আমলে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এতটাই স্বচ্ছন্দবোধ করত যে, তাদের সেই সময়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

১৩৬০ সালে মুরাদ তৎকালীন থ্রেস বা রুমানিয়া এবং ১৩৬১ সালে গ্রিস বাহিনীকে পরাজিত করে আড্রিয়ানোপল বা আইদিন দখল করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এরপর অটোমানরা ধীরে ধীরে বুলগেরিয়া, মেসোডোনিয়া, সার্বিয়া ও হাঙ্গেরির দিকে পৌঁছে যায়। ১৩৬৬ সাল হতে ১৩৬৯ সাল পর্যন্ত এই তিন বছরে অটোমানরা মারিতজা উপত্যকা এবং দক্ষিণ বুলগেরিয়া দখল করে ফেলেন। ১৩৭১ সালে বুলগেরিয়া সার্বিয়ার সাহায্য নিয়ে উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পরাজিত হয়। ১৩৭১ সালে সুলতান মুরাদ সার্বিয়ার কিছু অংশ জয় করেন এবং এই যুদ্ধে সার্বিয়ার তিন যুবরাজ নিহত হয়। ১৩৭২ সালে সুলতান মুরাদ ভার্ডার নদী অতিক্রম করে পূর্ব দিকে রওনা হলে স্টিফেন দুশনের মেসোডোনিয়া সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ১৩৮০ সালে আলবেনিয়া

এবং ১৩৮৫ সালে সার্বিয়া শহর দখল করে। মুরাদের বালকান বিজয়ের ফলে অটোমানরা ধীরে ধীরে ইস্তানবুল বা কনস্টান্টিনোপল হতে বেলগ্রেড পর্যন্ত রোমান মহাসড়কের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ দখল করে নেন। ঐতিহাসিকদের মতে মাত্র ৮৭ বছর পূর্বে অটোমানদের সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ঘোড়া দিয়ে যেতে তিন দিন লাগত, সেখানে বর্তমানে প্রয়োজন বিয়াল্লিশ দিন।

১৩৮৮ সালে বুলগেরিয়া বিজয়ের পর বয়স্ক সুলতান সার্বিয়ার কসোভো প্রান্তরে সম্রাট লাজারের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে উসমানিরা বিজয়ী হয়। যুদ্ধ চলা অবস্থায় লাজারের জামাতা মিলশ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে সুলতান মুরাদের নৈকট্য পেয়ে তাঁর কাছে চলে আসে। কিন্তু মিলশ সুলতানের নিকট হাঁটু গেড়ে বশ্যতা স্বীকারের অভিনয় করার সময় লুকিয়ে রাখা ছোটো ছুরি তাঁর বুকে ঢুকিয়ে দেয়। এতে সুলতান মুরাদ নিহত হন এবং প্রহরীদের আক্রমণে মিলশও নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে সম্রাট লাজারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আবার অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, কসোভো রণাঙ্গনে বিজয়ের পর কভিলভিম নামে এক স্লাভ সৈনিক অতর্কিত হামলায় মুরাদকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। সুলতান উসমানের ৩৮ বছরের শাসনকালে উসমানি খিলাফতের ভিত্তি তৈরি হয়, সুলতান ওরহানের ৩৩ বছরের শাসনকালে সেই ভিত্তি মজবুতি পায় এবং প্রথম মুরাদের ৩০ বছরের শাসনামলে এই সালতানাত বিস্তৃতি, সক্ষমতা প্রদর্শন ও সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যমে ইউরোপের মধ্য সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিন শাসকের গড়ে তোলা এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই উত্তরসূরীরা অনেক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও ছয়শত ছত্রিশ বছর টিকে ছিল। পঁচানব্বই হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড নিয়ে সুলতান মুরাদ যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, ত্রিশ বছরের শাসনামলে তা পাঁচ লাখ বর্গমাইলে পৌঁছে যায়।

**ইলদিরিম বেয়াজিদ, প্রথম মেহমেদ ও দ্বিতীয় মুরাদ :** সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলদিরিম বেয়াজিদ (Yildirim Beyazid) ১৩৮৯ সালে শাসন ক্ষমতায় বসেন। তর্কিশ ভাষায় ইলদিরিম অর্থ বিদ্যুৎ চমকানো। যুদ্ধক্ষেত্রে তার ক্ষিপ্ততা প্রদর্শনের জন্য তাকে ইলদিরিম উপাধি দেওয়া হয়। ইলদিরিম ক্ষমতায় বসে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নিজের প্রথম আদেশের মাধ্যমেই আপন ভাই ইয়াকুপকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাঁর ভ্রাতৃহত্যার এই সংস্কৃতি উসমানি খিলাফতে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেয়, যা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও চলতে থাকে। সেনানায়ক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু পিতা কিংবা পূর্বপুরুষের ন্যায় ধৈর্য ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন না। কসোভো যুদ্ধ ক্ষেত্রে পিতা মুরাদ নিহত হলে বেয়াজিদ প্রতিশোধের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। যে সার্ব বাহিনী সুলতান মুরাদকে হত্যায় আনন্দ মেতে উঠেছিল, বেয়াজিদ অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বাহিনীর ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তাদের সকল গৌরব ও বীরত্বকে ধুলোয় মিশে দেন। সম্রাট লাজারের পুত্র স্টিফেন বালকোভিটজ পরাজয় মেনে নিয়ে ইলদিরিম বেয়াজিদের সাথে সমঝোতায় আসেন। নিয়মিত কর প্রদানের মাধ্যমে উসমানি খিলাফতের অধীনস্থ রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। স্টিফেন বালকোভিটজ তাঁর বোন অলিভেরা ডেসপিনারকে সুলতানের সাথে বিবাহ দেয়। সেইসঙ্গে তার সৈন্য বাহিনী দিয়ে উসমানি খিলাফতকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি

দেয়। সুলতানের এই সার্ব স্ত্রীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে সুলতানের নৈতিক পদচ্যুতির অভিযোগ আসে, যা খিলাফতের সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছিল।

বেয়াজিদ এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ড জয় করলেও পূর্বপুরুষদের ন্যায় রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ছিলেন না। তাই এই অঞ্চলগুলোকে উসমানি খিলাফতের নিয়ন্ত্রণে আনার পরেও প্রকৃত শাসনাতলে আনতে পারেননি। এশিয়া বিজয়ের পর বেয়াজিদ আবারও ইউরোপে অগ্রসর হয়ে ১৩৯৩ সালে বুলগেরিয়া এবং উত্তর গ্রিস, ১৩৯৪ সালে হাঙ্গেরির ওয়ালাসিয়ান, ১৩৯৭ সালে কারামান ওকচায়, ১৩৯৮ সালে দিজানিক, এলবিস্তান এবং মালাতিয়া জয় করেন। ১৩৯৭ সালে গ্রিসের রানি হেলেন নিয়মিত কর প্রদান করার শর্তে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এসময় মধ্য এশিয়ার আরেক তুর্কমেন তৈমুর লং বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। ১৪০২ সালে তৈমুর লংকে প্রতিহত করার জন্য ইউরোপের সৈন্যদের এশিয়ার দিকে আনা হয়। সুলতান ইলদরম বেয়াজিদ তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তৈমুর লং-কে পান্ডা না দেওয়ায় দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। যুদ্ধের শুরুতেই উসমানি খিলাফতের তাতার সৈন্যরা স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে চলে গেলে সমগ্র বাহিনীর মাঝে অস্বস্তি তৈরি হয়। ভয়ংকর এই যুদ্ধে এক পর্যায়ে ইলদিরিম বেয়াজিদ গ্রেফতার হন এবং তাকে বেঁধে তৈমুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমান আফ্গান প্রদেশের চুবুক জেলায় এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কয়েক মাস গ্রেফতার থাকার পর ১৪০৩ সালে সুলতান বেয়াজিদ তৈমুর লং-এর কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

উসমানি খিলাফতের যাত্রার ১০৩ বছর পর তৈমুর ঝড়ে ভেঙে পরে সাজানো গোছানো এই সুবিশাল সাম্রাজ্য। নিহত হন স্বয়ং সুলতান ইলদিরিম বেয়াজিদ। এরপর শুরু হয় দশ বছরব্যাপি অনাকাজিক্ষিত রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। এক শতাব্দী পর ভেঙে পরা এই উসমানি খিলাফতকে যিনি নতুন করে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তিনি হলেন প্রথম মেহমেদ। ইতিহাসে তিনি অটোমান সালতানাতে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। ১৪২১ সালে সুলতান প্রথম মেহমেদ ৪২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান প্রথম মেহমেদ নতুন রাজ্য বেশি জয় না করলেও তিনি ভেঙে পড়া উসমানি খিলাফতকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। যা তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে পাঁচশত বছরের জন্য শাসনের পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

পিতা প্রথম মেহমেদের মৃত্যুর পর ১৪২১ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে দ্বিতীয় মুরাদ ক্ষমতায় বসেন। ক্ষমতার সূচনালগ্ন থেকেই তাকে অনেক বেশি অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। মুরাদের ন্যায় তাঁর তেরো বছরের ছোটো ভাই মোস্তফাও সৈন্যদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। মোস্তফা ক্ষমতার উত্তরাধিকার দাবিতে বিদ্রোহ করে বসলে বিভিন্ন এলাকা মুরাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। সুলতানের কারামানিয়া বাহিনীও মোস্তফার সাথে যোগ দেন। সুলতান মুরাদ জানিসারিসদের সহযোগিতা, আলেমদের সমর্থন এবং তার সৈন্যদের সাহসী ভূমিকার বলে মোস্তফাকে দমন এবং তার অনুসারীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের পর

সুলতান মুরাদ ইউরোপের দিকে নজর দেন। এসময় ইউরোপের দুই বৃহৎ শক্তি হাঙ্গেরি ও ভেনিস উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধাচারণ করে। এমনকী উসমানিদের ইউরোপ থেকে হটানোর পাশাপাশি ইস্তান্বুল বা কনস্টান্টিনোপল বিজয়েরও ঘোষণা দেয়। ১৪৩০ সালে সুলতান মুরাদ ভেনিস, ১৪৩৮ সালে সার্বিয়ার একাংশ এবং ১৪৪৩ সালে ভার্না প্রান্তরে হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হন। ১৪৪৪ সালে সুলতান মুরাদ তাঁর পুত্র মেহমেদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে অবসরে যান। কিন্তু কিছুদিন পর প্রধান উজির হালিলের সাথে মেহমেদের সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় তিনি আবারও ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৪৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

**ফাতিহ সুলতান মেহমেদ :** একটি হাদিস উল্লেখ করে ফাতিহ সুলতান মেহমেদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা যাক।

‘কনস্টান্টিনোপল একদিন বিজয় হবে, সেই সেনাপতি কতই না উত্তম! তাঁর অধিনে যারা যুদ্ধ করবে, তারাও কতই না উত্তম!’

রাসুল (সা)-এর অনেক সাহাবি হাদিসে বর্ণিত সেই সম্মানের আশায় ইস্তান্বুল বা কনস্টান্টিনোপল আক্রমণে এসেছিলেন। সাহাবি আইয়ুব আল আনসারি তাঁদের মধ্য একজন, যিনি ইস্তান্বুল শহরের দেওয়ালের কাছে শহিদ হন এবং সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ-ই সেই সফলতা অর্জন করতে পারেননি। সুলতান মেহমেদ সেই মহান বিজয়ী বীর, যিনি মুসলমানদের কয়েকশত বছরের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে ফাতিহ সুলতান বা বিজয়ী সুলতান উপাধী পেয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সুলতান মেহমেদ ১৪৩২ সালে তুরস্কের এদের্ন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে তিনি সুলতানের কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীর সন্তান নন; বরং দাসীর সন্তান ছিলেন। ১৪৩৮ সালে মাত্র ছয় বছর বয়সে আমাসিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুলতান মুরাদের একাধিক পুত্র সন্তান থাকলেও বেশিরভাগ সন্তানেরা অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় মেহমেদের ব্যাপারে তার শিশু ভাইদের হত্যার অভিযোগ রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ১৪৫১ সালে ১৯ বছর বয়সে মেহমেদ পুনরায় সিংহাসনে বসেন। সুলতান মেহমেদ তার শিশুকাল থেকেই ইস্তান্বুল বা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন।

সুলতান মেহমেদ সর্বপ্রথম গান পাউডারের ব্যবহার শুরু করেন, যখন কিনা পশ্চিমা দুনিয়ায় কোথাও তখন প্রচলন শুরুই হয়নি। হাঙ্গেরির এক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, আরবানের সহযোগিতায় এক সুবিশাল কামান নির্মান করেন, যা ছিল তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। এটি বহনের জন্য সাত শতাধিক সৈন্য এবং পনেরো জোড়া ঘাড়ের প্রয়োজন হতো। এই কামানের গোলা এক মাইল দূরত্বে গিয়ে ছয় ফিট গভীরে আঘাত হানতে পারত। তিনি ১৪৫২ সালে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক চৌকশ সৈন্য এনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। আক্রমণের পূর্বেই সুলতান

নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করেন, যা ছিল তৎকালীন বাইজেন্টাইনদের তুলনায় পাঁচ গুণ বড়ো ও শক্তিশালী। ২ এপ্রিল ১৪৫২ সালে সুলতান বিশাল বাহিনী নিয়ে ইস্তানবুলের দেওয়ালে পৌঁছায়। ৬ এপ্রিল থেকে শুরু করে টানা ছয় সপ্তাহ ইস্তানবুলের সীমানা লক্ষ্য করে কামানের গোলার বিস্ফোরণ চলতে থাকে। ২৮টি যুদ্ধ জাহাজের মাধ্যমে সমুদ্রপথেও তাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু উভয় আক্রমণে বাইজেন্টাইনরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উসমানিরা কাক্ষিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এসময় সুলতান ইতালিয়ান এক সৈন্যের পরামর্শে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতায় দুইশত ফিট উঁচু পাহাড় পাড়ি দেওয়ার জন্য রাস্তা তৈরি করেন। এভাবে পাহাড় বেয়ে সমুদ্রটি জাহাজ নামিয়ে দেওয়া হয়। তারা ভেতরে ঢুকে গোল্ডেন হর্ন নিয়ন্ত্রণে নিলে যুদ্ধের মোড় উসমানিদের পক্ষে চলে আসে।

টানা সাতান্ন দিন ধরে স্থল-জলপথে আক্রমণ ও অবরোধ চলার পর সৈন্যদের সাহসিকতায় মাটির নিচ দিয়ে পরিখা খনন করা হয়। এই পরিখা দিয়েই বাইজেন্টাইন সীমানায় সকলে প্রবেশ করে এবং ১৪৫৩ সালের ২৯ মে বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে উসমানিরা বিজয় নিশ্চিত করে। কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তানবুল বিজয়ের পর সুলতান রাজধানী আদ্রিয়াপল থেকে ইস্তানবুলে নিয়ে আসেন। ইস্তানবুলের বিখ্যাত গির্জা আয়া সোফিয়াকে তিনি মসজিদে রূপান্তর করেন। অদ্যবধি ২০১৮ সালেও সেই মসজিদ দেখতে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারো মুসলমান এবং খ্রিষ্টান এখানে আসে। সুলতান ইস্তানবুল বিজয়ের পর গির্জা, আশ্রম, প্রাসাদ, বাড়ি-ঘরে অবস্থানকারী সকলকে নিরাপদ ঘোষণা করে। সুলতানের উদারতা এবং তার ব্যবহারে এসময় হাজারো খ্রিষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তিনি সে সময়ের আলেম-উলামা, অর্থোডক্স খ্রিষ্টান পাদ্রি, আর্মেনিয়ান ধর্মীয় গুরুসহ সকলকে সমান ধর্মীয় মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বেতন-ভাতা দেন।

ইস্তানবুল বিজয়ের পর ১৪৫৪ সালে সুলতান তার পূর্বসূরীদের শত্রু সার্বিয়া আক্রমণে বের হন। ১৪৫৬ সালের জুলাই মাসে হাঙ্গেরির সৈন্যদের সাথে এক ভয়ংকর যুদ্ধের মাধ্যমে হুনয়াদির বাহিনীকে সুলতান পরাজিত করেন। ১৪৫৭ সালে সুলতান বেলগ্রেড আক্রমণ করে নিজে আহত হওয়ার পাশাপাশি প্রধান সেনাপতি নিহত এবং প্রচুর সৈন্য ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হন। সুলতানের এই পরাজয়ে সমগ্র ইউরোপে খুশির বন্যা দেখা দেয়। কিন্তু ১৪৫৭ সালে হুনয়াদির মৃত্যুর পর সার্বিয়া দুইভাগে বিভক্ত হলে সুলতান এক সফল অভিযানের মাধ্যমে বেলগ্রেড দখল করেন। ১৪৫৯ ও ১৪৬০ সালে সুলতান গ্রিস অভিযানে বের হয়ে এথেন্সসহ গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করেন। ১৪৬১ সালে সুলতান এশিয়া অভিযানে বের হন। ১৪৬২ সালে উসমানি বাহিনী ওল্লাহিয়া জয় করেন। ১৪৬৩ সালে সুলতান বসনিয়া, ১৪৬৭ সালে সমগ্র আলবেনিয়া, ১৪৭৫ সালে বর্তমান ইউক্রেনের অন্তর্গত ক্রিমিয়া শহর, ১৪৭৫-১৪৭৬ সালে উসমানিরা মলদোবা, ১৪৭৭ সালে ভেনিসের কিছু অংশ, ১৪৭৯ সালে স্কুটারি, ক্রোইয়া, মোরিয়া অঞ্চল ও রোদস আইল্যান্ড উসমানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।



ফাতিহ সুলতান মেহমেদ বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী সরকারব্যবস্থা ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সময় সালতানাতের সীমানা খুব বেশি না বাড়লেও সুলতান ইলদিরিম বেয়াজিদের মৃত্যুর পর পিতামহ প্রথম মেহমেদ সাম্রাজ্যকে গোছানোর একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। ফাতিহ সুলতান মেহমেদ তা সফলভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উসমানি খিলাফতের অন্যতম সেরা এই বিজয়ী সুলতান ১৪৮১ সালের ৪ মে এশিয়ায় গোপন অভিযানের সময় মৃত্যুবরণ করেন। ইস্তানবুল বা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মহানায়ক এই সুলতান ইতিহাসে ফাতিহ সুলতান বা বিজয়ী সুলতান হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকেন। তাঁর বীরত্ব তর্কিশদের পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে।

**দ্বিতীয় বেয়াজিদ ও ইয়াবুস সেলিম :** পিতা ফাতিহ সুলতান মেহমেদের মৃত্যুর পর ১৪৮১ সালে ক্ষমতায় আসেন তাঁর সন্তান দ্বিতীয় বেয়াজিদ। তবে তাঁর ক্ষমতায় আসার পথ ততটা মৃণ ছিল না। এজন্য তাকে নিজ ভাই জেমের সাথে সিংহাসন দখলের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। জেম পরাজিত হয়ে মিসরের মামলুকদের অধিনে এবং পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয়ান কিছু দেশের অধিনে আশ্রয় নেয়। সুলতান হিসেবে বায়েজিদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সফলতা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। তিনি শুরু হতে ইউরোপের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যস্ত ছিলেন। যদিও তাঁর সময়ে উসমানি খিলাফতের নৌবাহিনী অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয় বেয়াজিদ তার শাসনামলে ১৪৮৪ থেকে ১৪৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় ছয়বার মিসরের মামলুক শাসকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৪৯১ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে সেই যুদ্ধের অবসান হয়। ১৫০৩ সালে ভেনিসের সাথে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়। ১৪৯২ সালে সীমাহীন নির্যাতনের ফলে স্পেন থেকে প্রচুর মুসলমান পালিয়ে আসে। অটোমান নৌবাহিনী তাদের নিরাপদে নিজেদের রাষ্ট্রে নিয়ে আসে।

সুলতান বেয়াজিদের শাসনামলে ইরানের শিয়া নেতা ইসমাইল শাহ তাঁর মতবাদের কারণে এ অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে শিয়াদের সাথে অটোমানদের ধর্মীয় দূরত্ব বেড়ে যায়। ১৫১০-১৫১১ সালে একাধিকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৫১১ সালে ইরানের সঙ্গে এক যুদ্ধে উসমানিরা বিজয়ী হয়। যদিও যুদ্ধে উসমানি সেনাপ্রধান আজম আলি পাশা এবং শিয়া সেনাপ্রধান শাহ কুলি নিহত হন।

দ্বিতীয় বেয়াজিদের শেষ সময়ে তার দুই সন্তান ইয়াবুস সেলিম ও আহমেদের দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। বাবার শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকায় ইয়াবুস সেলিম ১৫১২ সালের ২৫ এপ্রিল সুলতান বেয়াজিদকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেন। সুলতান বেয়াজিদ ক্ষমতা হস্তান্তর করে ডোমোটিকার দিকে রওনা হলে ১৫১২ সালের ২৬ মে পশ্চিমমুখে মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান ইয়াবুস সেলিমের নির্দেশে তার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল বলে গুজব রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে প্রথমে তিনি সিংহাসন সুসংহত করতে দুই ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেন।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ধার্মিক হলেও অনেক ঐতিহাসিক তাকে ধর্মীয় উন্মাদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১৫১৬ সালে মার্স দাবিক যুদ্ধে ইয়াবুস সেলিম মামলুকদের পরাজিত করে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, হেজাজ বা সৌদি আরবসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য দখল করে নেন। ১৫১৭ সালে রিদানিহ যুদ্ধে মামলুকদের পরাজিত করে কায়রো দখল করে নেন সেলিম। আব্বাসি খিলাফতের প্রতীকী সুলতান তৃতীয় আল মুতাওয়াঙ্কিলকে বন্দি করে ইস্তান্বুলে প্রেরণ করেন। আল মুতাওয়াঙ্কিলকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইয়াবুস সেলিম নিজেই খলিফা পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৫২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে সুলতান ইয়াবুস সেলিম মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াবুস সেলিমের শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্রাট ছিল বাবর। তার সাথেও উসমানীয়দের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

**সুলতান সুলাইমান :** উসমানি খিলাফতের ইতিহাসে যে কয়জন সুলতান স্বীয় কর্ম, সাহসিকতা ও বীরত্বের কারণে অমর হয়ে আছেন, সুলতান সুলাইমান তাদের মধ্যে অন্যতম। মধ্যযুগীয় অন্ধকার ও মৃতপ্রায় সামন্তবাদী সভ্যতাকে হটিয়ে ইউরোপব্যাপী নতুন রেনেসাঁসের আলো যখন বিকশিত হওয়া শুরু করে, তখন দশম অটোমান সুলতান হিসেবে ছাব্বিশ বছর বয়সী সুলতানের আগমনে পশ্চিমা সভ্যতার খ্রিষ্টান দুনিয়ার সাথে উসমানি খিলাফতের ক্ষমতার ভারসাম্যের নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কানুনে সুলতান হিসেবে খ্যাত সুলাইমান ১৪৯৫ সালের ২৭ এপ্রিল তুরস্কের ট্রাবজন শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

সুলতান সুলাইমান সিংহাসনে এসে হাঙ্গেরির শাসন থেকে বেলগ্রেড উদ্ধারের জন্য ১৫২১ সালে অভিযানে বের হন। ১৫২২ সালে গ্রীষ্মকালে সুলতান রোডস-এ পৌঁছে সেখানকার চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে সেপ্টেম্বর মাসে আক্রমণ শুরু করেন। সে সময় মিসরে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুলতান তার বন্ধু ও উজির পারগেলি ইব্রাহিম পাশাকে মিসরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেন। উজির ইব্রাহিম পাশা বিদ্রোহী আহমেদ পাশাকে পরাজিত করে সেখানে দীর্ঘ এক বছর অবস্থান করে ইস্তান্বুলে ফিরে আসেন। ১৫২৬ সালের ২৩ এপ্রিল লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে সুলতান হাঙ্গেরি জয় করেন। ১৫২৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর সুলতান বুদাপেস্টে প্রবেশ করে ছয় মাস অবস্থান শেষে ইস্তান্বুলে ফিরে আসেন। ১৫২৭ সালে আনাতোলিয়ার আদানা ও তারসুসে বিদ্রোহ শুরু হলে সুলতানের নির্দেশে ইব্রাহিম পাশা শক্ত হস্তে তা দমন করেন। ১৫২৯ সালের ১০ মে সুলতান এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ভিয়েনা অভিযানে বের হন। বৈরী আবহাওয়া, প্রতিকূল পরিবেশ এবং ভিয়েনার রাজা ফার্দিনান্ডের শক্তিশালী প্রতিরক্ষার কারণে সুলতান প্রথমবারের মতো পরাজয়ের স্বাদ নিয়ে এই অভিযান বন্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ভিয়েনা থেকে ফিরে আসেন। ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সুলেমান হাঙ্গেরি অভিযানে বের হন। ৬ সেপ্টেম্বর এসজিগেতিয়ার যুদ্ধে (Battle of Szigetvár) বিজয়ের আগের রাতে সুলতান সুলেমান তাঁর নিজ তাঁবুতে মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান সুলেমানের মূল কবর তুরস্কে হলেও তার হৃৎপিণ্ডটি হাঙ্গেরির সিগেতভার শহরের আগ্রুর কুঞ্জে কবর দেওয়া হয়েছিল। যদিও এটি কোনো প্রতিষ্ঠিত মত নয়। তারপরও সুলেমানের হৃদয়ের খোঁজে বহুজাতিক বিশেষজ্ঞ দল এখনও সক্রিয় রয়েছে।

উসমানি খিলাফতের আইনি বিধিবিধানসমূহের দুটো দিক ছিল। একটি শারিয়াহ, অপরটি সুলতান নির্দেশিত আইন; যা ‘কানুন’ হিসেবে পরিচিত ছিল। সুলতান উসমান থেকে সুলতান ইয়াবুস সেলিম পর্যন্ত নয়জন সুলতানের শাসনামলে অগণিত কানুন জারি ছিল। ফলে আইনি বিধিবিধানসমূহের বাস্তবায়ন খুব জটিল হয়ে পড়েছিল। সুলতান সুলেয়মান ইতঃপূর্বে জারি করা সকল আইন পুনর্গঠনের জন্য সাম্রাজ্যের গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আল ইসলাম এবুসসুদ এফেন্দির সহযোগিতা নিয়ে কাজ করেন। শরিয়াহ ও অন্যান্য কানুনের সাথে সাংঘর্ষিক কি না তা চূড়ান্ত করার জন্য প্রতিটা আইন যাচাই-বাছাই করে আইনি বিধিবিধানসমূহ প্রণয়ন করেন, যা উসমানি আইন হিসেবে পরিচিত ছিল। সুলতান সুলাইমানের পর ৩০০ বছর এই আইনের অধীনেই উসমানি সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছিল। ইউরোপসহ পশ্চিমা বিশ্বেও এই আইনের প্রভাব ছিল। সুলতান সুলেয়মানের এই অসামান্য অবদানের জন্য ইতিহাসে তাকে ‘কানুনি’ বা ‘আইনপ্রণেতা’ হিসেবে অবিহিত করা হয়।

### উসমানি খিলাফতের অধঃপতন (১৫৫৬-১৭৮৯)

সুলতান সুলাইমানের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উসমানি খিলাফত ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে উসমানি খিলাফত একদিকে দক্ষ শাসকের অভাবে সামরিক শক্তিতে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে, অপরদিকে নৈতিক শক্তিতে নেমে আসে চরম পদঃস্থলন। ১৫৬৬ সালে সুলতান সুলাইমানের মৃত্যুর পর সুলতান সেলিম হতে শুরু হয়ে ১৭৮৯ সালে ‘রাষ্ট্র ও খিলাফতের সংস্কার’ আন্দোলন শুরু হওয়া পর্যন্ত তারা ছিল ভোগবিলাসে মত্ত। এই সময়ের মাঝেই তারা পূর্বপুরুষদের জৌলুষ হারিয়ে ধীরে ধীরে ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যায়। সুলতান সুলাইমানের পর ক্ষমতায় আসে তাঁর অযোগ্য ও মদ্যপায়ী ছেলে সুলতান সেলিম। মূলত সুলতানদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করেই সমগ্র শাসনক্ষমতা পরিচালিত হতো। কিন্তু সুলতানদের দায়িত্বে অবহেলা, রাষ্ট্রীয় কাজে মনোযোগের অভাব, সরকারি দায়িত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতিসমূহের মাঝে সমন্বয়ের অভাবে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পরিবর্তে তা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসে। ইউরোপে সম্প্রসারণের পরিবর্তে খিলাফত আনাতোলিয়া ভূখণ্ডে সংকুচিত হয়ে যায়। যদিও উসমানি খিলাফতের এই করুণ পরিণতির জন্য অনেক ঐতিহাসিকরা সুলতান সুলাইমানের কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্তকেই দায়ি করে থাকেন।

সুলাইমানের দুই স্ত্রীর ৫ ছেলের মধ্য সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন প্রথম স্ত্রী মাহি দেভরানের ছেলে শাহজাদা মোস্তফা। ঐতিহাসিকদের মতে সুলতান সুলাইমানের ২য় স্ত্রী ইউক্রেন বংশদ্ভূত হুররেম সুলতান এবং জামাই রুস্তম পাশার ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করে ক্ষমতা দখলের অভিযোগে প্রথমে শাহজাদা মোস্তফা এবং পরবর্তী সময়ে তার শিশু সন্তানকেও হত্যা করেন। মোস্তফার মৃত্যুর পর সেনাবাহিনী এবং জানিসারি বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা যায়। মানিসা, আমাসিয়া এবং কোনিয়া প্রদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়। কারণ, এই এলাকার জনগণ এবং সমগ্র আনাতোলিয়ার অধিকাংশ জনগণ শাহজাদা মোস্তফাকেই তাদের পরবর্তী সুলতান মনে করত।

সুলতান সুলাইমানের ৫ ছেলের প্রথম জনকে হত্যার পর অপর দুই সন্তান মেহমেদ এবং জাহাঙ্গির অসুস্থতায় মারা যায়। জীবিত দুই সন্তান শাহজাদা বায়েজিত এবং সেলিমের মধ্যে বায়েজিত রাগি স্বভাবের হলেও তিনি সেলিমের তুলনায় অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের ফলে সুলাইমানের নির্দেশে বায়েজিত এবং তার ৪ সন্তানকে ইরান থেকে এনে হত্যা করা হয়। একমাত্র জীবিত সন্তান সেলিম ছিলেন মদ্যপায়ী এবং আরামপ্রিয়। সাধারণ জনতার কাছে সেলিম ‘স্বর্ণকেশী সেলিম’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মদ্যপানে অত্যাধিক আসক্ত হওয়ায় প্রধান উজির সোকল্লু মেহমেদ রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তাঁর ৮ বছরের শাসনাকাল থেকেই উসমানি খিলাফত নিজের গুণগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পতনের দিকে যাত্রা শুরু করে। সুলতান সেলিম তাঁর দায়িত্বরত অবস্থায় কোনো যুদ্ধে অংশ নেননি।

১৫৭৪ সালে সেলিমের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান ৩য় মুরাদ ক্ষমতায় বসেন। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই তিনি তাঁর অপর ৫ ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়। তার দীর্ঘ ২১ বছরের শাসনামলে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করে যেতে পারেনি। ভোগবিলাসী এই সুলতানের ওপর ৪ নারীর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তার মা নুর বানু, বোন- যিনি ছিলেন প্রধান উজির সকলুর স্ত্রী, তার ভেনিসীয় স্ত্রী সোফিয়া এবং হেরেমের অপর নারী জানা ফিদা। ১৫৯৫ সালে ৩য় মুরাদ মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয় মুরাদের পর ক্ষমতায় আসে তার সন্তান ৩য় মাহমুদ। ক্ষমতায় এসেই ১৯ ভাইকে হত্যা করে ইতিহাসের জঘন্য জায়গায় সে স্থান করে নেন। ভাইদের হত্যার পাশাপাশি হেরেমের গর্ভবতী মহিলাদের বস্তাবন্দি করে বসফরাসে নিক্ষেপ করেন। মাহমুদের ওপর তার ভেনিসিও মা সোফিয়ার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তার শাসনামলে উল্লেখযোগ্য বিজয় না থাকলেও ১৬০৩ সালে ইরানি শাহ আব্বাস তাবরিজ খিলাফতের কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, ১৬০৩ সালে এক দরবেশ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সুলতান ৫৫ দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে। প্রচণ্ড কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে সুলতান মানসিকভাবে ভেঙে পরে এবং ওই সময়েই মৃত্যুবরণ করেন।

তার মৃত্যুর পর ১৪ বছর বয়সী শিশুসন্তান প্রথম আহমেদ ক্ষমতায় বসেন। বাবা দাদার মতো সে অযোগ্য ছিল না; বরং তুলনামূলক সাহসী ছিলেন। ১৬০৫ সালে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে অভিযানে আহমেদ কিছুটা সফলতা পায়, কিন্তু ১৬১২ সালে ইরানের সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে ১৫৯০ সালে অর্জিত ভূখণ্ডের কুর্দিস্থান ছাড়া বাকি অংশ ইরানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৬১৭ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে সুলতান প্রথম আহমেদের মৃত্যুর পর প্রথমবারের মতো ছেলের পরিবর্তে ক্ষমতায় আসে তার অপ্রকৃতিস্থ ভাই মোস্তফা। কিন্তু মাত্র সে ৩ মাস পরেই পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগের পর ১৬১৮ সালে সুলতান আহমেদের সন্তান দ্বিতীয় উসমান ১৪ বছর বয়সে ক্ষমতায় বসেন। ১৬২২ সালে সুলতান উসমান মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতির প্রাক্কালে জানিসারি বাহিনী বিদ্রোহ করে। তারা প্রাসাদে ঢুকে নিরাপত্তা প্রহরী এবং প্রধান উজিরকে হত্যা করে। অতঃপর সুলতান উসমানকে গ্রেফতার করে কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যা করে।

এই হত্যার মাধ্যমে খিলাফতের প্রথম কোনো সুলতান তার অধীনস্থ বাহিনীর হাতে নিহত হয়। সুলতানের মৃত্যুর পর পুনরায় অপ্রকৃতিস্থ মোস্তফাকে কয়েক মাসের জন্য সুলতান বানাতেও পরে তাকে পুনরায় পদচ্যুত করা হয়। ১৬২৩ সালে তার স্থলে ক্ষমতায় বসানো হয় উসমানের ১১ বছরের পুত্র মুরাদকে।

মুরাদ শাসক হিসেবে তার বাবা উসমানের চেয়ে কিছুটা দক্ষ ছিলেন। প্রায় এক দশক মায়ের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে শাসন পরিচালনার পর নিজে দক্ষ ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তার মা ইতিহাসে কোসেম সুলতান হিসেবে পরিচিত। সিপাহীরা বিদ্রোহ করলে তাদের মদদ দেওয়ার অভিযোগে সুলতান নিজের দুই প্রধান উজিরকে হত্যা করেন। এরপর ক্রমাগতভাবে সুলতান সামান্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে অগণিত রাজ কর্মচারীদের ফাঁসি দিয়েছিলেন। নিজের চিকিৎসককে অতিরিক্ত ওষুধ খাইয়ে হত্যা, পারস্যের গান গাওয়ার অপরাধে নিজের বাজনাবাদককে হত্যা, গানের শব্দে তার ঘুম ভাঙায় গায়কদের হত্যাসহ ৫ বছরে ২৫ হাজারের অধিক ব্যক্তিকে সে হত্যার ঘোষণা দেন। ১৬৩৪ সালে সুলতান মুরাদ তার শেষ অভিযানে বের হয়ে বাগদাদ পুনরুদ্ধার করেন। বাগদাদ বিজয় ছিল তার ১৭ বছরের শাসনামলের সবচেয়ে বড়ো অর্জন। ১৬৪০ সালে ২৮ বছর বয়সে সুলতান মুরাদ মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান মুরাদের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাই মৃত্যুর পর তার ভাই ইব্রাহিম ক্ষমতায় বসেন। যদিও মুরাদ মৃত্যুর আগে তার ভাইয়ের মৃত্যুর আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তার মা মুরাদকে না জানিয়ে কৌশলে সেটি বন্ধ করেছিল। মৃত্যুর আশঙ্কা আর ভয়-ভীতির মধ্যে বড়ো হওয়া সুলতান ইব্রাহিম অযোগ্য শাসক হলেও তার প্রধান উজির বা প্রধানমন্ত্রী ছিল কিছুটা যোগ্য ও দক্ষ। কিন্তু বাগদাদ বিজয়ের এই নায়ক উজির কারা মোস্তফার সাথেও সে হেরেমসংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সুলতান কারা মোস্তফার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। সুলতান ইব্রাহিম তার আট বছরের শাসনামলের পুরো সময়টাই হেরেমে আমোদ-ফুর্তি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেনাবাহিনী, জানিসারি, আলেম সমাজ, প্রধান মুফতি সবাই এক হয়ে সুলতানকে পদচ্যুত করতে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। সকলের সিদ্ধান্তে সে সময় ইব্রাহিমের সন্তান মেহমুদকে খলিফার পাগড়ি পরানো হয়। প্রধান মুফতির নির্দেশে ১৬৪৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো উসমানি খিলাফতের সুলতানকে হত্যা করা হয়।

১৬৪৮ সালে ইব্রাহিমের পুত্র ৭ বছর বয়সী মেহমেদ ক্ষমতায় আসেন। সাত বছর বয়স্ক সুলতান রাজ্য পরিচালনায় সক্ষম না হওয়ায় তার যোগ্য উজির মাহমুদ কপরুলু মূলত রাজ্য পরিচালনা করতেন। উসমানি খিলাফতের সৌভাগ্য যে, এই সময় একই বংশের কিছু যোগ্য উজির পেয়েছিল, যারা দীর্ঘদিন খিলাফতকে টিকিয়ে রেখেছিল। শাসনামলের প্রথম ৮ বছর জানিসারি এবং সিপাহীদের কোন্দল লেগে থাকায় অনেকবার রাজদ্রোহ হয়। ৭১ বছর বয়স্ক নতুন উজির ১৬৫৬ সালে নিয়োগ পেয়ে সফলতার সাথে এগুলো দমন করেন। রাজ্যে শান্তি ফিরে আনতে

পর্যায়শ হাজার বিশৃঙ্খলাকারীকে হত্যার নির্দেশ দেয় উজির। ৫ বছর পর ১৬৬১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তার সন্তান আহমেদ কপরলু প্রধান উজির হয়। ১৬৭৬ সালে আহমেদ কপরলুর মৃত্যুর পর অযোগ্য উজির কারা মোস্তফার কারণে একে একে সব যুদ্ধে পরাজিত হয়। ১৬৮৪ সালে অস্ট্রিয়া-উসমানিদের নিকট থেকে ক্রোয়েশিয়া ও হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট দখল করে। ১৬৮৫ সালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বাকি অংশ উসমানিদের নিকট থেকে নিয়ে নেয়। ১৬৮৮ সালে পোলান্ড যুদ্ধেও উসমানিরা পরাজিত হয়। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে অযোগ্য শাসক ৪র্থ মুরাদের দীর্ঘ ৩৮ বছরের শাসনামলে উসমানিরা বিভিন্ন যুদ্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হারিয়ে ফেলে। উসমানি খিলাফতে নেমে আসে এক অন্ধকার যুগ।

মেহমেদের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসে দ্বিতীয় সুলাইমান। সুলাইমান সুলতান হওয়ার পূর্বে দীর্ঘদিন জেলে থাকায় তার সামরিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল না। সে সময় রাষ্ট্রে জানিসারিদের বিদ্রোহ বেড়ে যাওয়ায় প্রচুর হত্যাকাণ্ড ঘটে। এমনকী তারা প্রধান উজিরকেও হত্যা করে। ১৬৮৮ সালে অস্ট্রিয়া-উসমানিদের হাত থেকে বেলগ্রেডকে দখল করে নেয়। ১৬৮৯ সালে সুলাইমান অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পরাজিত হন। রাষ্ট্রের এমতাবস্থায় সুলতান ২য় সুলাইমান আহমেদ কপরলুর ২য় পুত্র মোস্তফা কপরলুরকে প্রধান উজির করেন। দক্ষ এবং ধার্মিক মোস্তফা কপরলুর ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং হারিয়ে যাওয়া ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে মনোযোগ দেন। ১৬৯০ সালে মোস্তফা কপরলুর অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধে কয়েকটি হারানো এলাকা আবারও দখল করে নেন। অতঃপর বেলগ্রেড এবং ট্রানসিলভানিয়াও দখল করে নেন। দীর্ঘ সময় পর উজির মোস্তফা কপরলুর-এর সাহসিকতায় উসমানি খিলাফত হারানো কিছু অঞ্চল ফেরত পান। কিন্তু ১৬৯১ সালে দানিযুব পেরিয়ে উসমানিরা অস্ট্রিয়ার সাথে ভয়ংকর যুদ্ধের মুখমুখি হন। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত উসমানিরা পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের কিছুদিন পরেই সুলতান সুলাইমান এই অভিযানে নিজেই মৃত্যুবরণ করেন। সুলাইমানের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আহমেদ ক্ষমতায় আসেন কিন্তু তিনিও চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ৪ বছর পরেই ১৬৯৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অবশেষে ১৬৯৫ সালে চতুর্থ মেহমেদের পুত্র দ্বিতীয় মোস্তফা সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় আসেন।

দ্বিতীয় মোস্তফা পিতা কিংবা দাদার মতো শিকারি না হয়ে পূর্বপুরুষদের ন্যায় উসমানিদের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে কাজ শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় মোস্তফা ক্ষমতায় এসে ১৬৯৬ এবং ১৬৯৬ সালে পরপর দুইটি অভিযানে বের হন। যদিও তার সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যরা এই অভিযানের বিপক্ষে ছিল। ১৬৯৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ‘দ্যাট্রিটি অফ কার্লোডিইটস’ চুক্তি অনুযায়ী উসমানি খিলাফত বার্নাত ব্যতীত সমগ্র হাঙ্গেরি অস্ট্রিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। চুক্তির পর প্রধান উজির হুসাইন কপরলু প্রাসাদ ষড়যন্ত্র পদচ্যুত হয়। তার মতো যোগ্য শাসকের অভাবে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ বেড়ে যায়। সুলতান এগুলো দমন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৭০৩ সালে পদত্যাগ করেন।

১৭০৩ সালে রাষ্ট্রের চরম ব্যর্থ মুহূর্তে আগমন ঘটে মোস্তফার ভাই আহমেদের। তার শাসনামলের প্রথম ৬ বছর রাষ্ট্রে শান্তি থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা অব্যাহত থাকেনি। ‘দ্যা ট্রিটি অফ কার্লোডিইটস’ ভেঙে রাশিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা শুরু করে। ১৭১৭ সালে অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধে হাঙ্গেরি, ১৭১৮ সালে হাঙ্গেরি, সার্বিয়ার সম্পূর্ণ অংশ এবং বসনিয়ার কিছু অংশ উসমানিরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৭২০ সালে সুলতান তার এক দূতকে ফ্রান্সে পাঠায় তাদের সামরিক কৌশল, দুর্গ, কারখানাসহ ফরাসি সভ্যতা থেকে ইতিবাচক কিছু বিষয় দেখে এসে উসমানি খিলাফতে তা প্রতিফল করবে বলে। সুলতান শেষ বারো বছর উজিরের হাতেই মূল ক্ষমতা দিয়ে নিজে হারেমে চার দেওয়ালে আমদ, ফূর্তি আর টিউলিপ ফুল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সে সময় জানিসারিদের বিদ্রোহে প্রধান উজির ইব্রাহিম পাশা, প্রধান অ্যাডমিরালসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা নিহত হন। সুলতান তার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম মাহমুদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

যে অটোমানরা একসময় ইউরোপ শাসন করার স্বপ্ন দেখত, তারাই এসময় প্রতিপক্ষকে ঠেকানোর জন্য ইউরোপের আরেক শক্তি ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। ১৭৩৯ সালে রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া উসমানিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার চিন্তা করলেও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় ‘বেলগ্রেড চুক্তি’-তে আবদ্ধ হয়। বেলগ্রেড চুক্তি ছিল উসমানি খিলাফতের সর্বশেষ সম্মানজনক চুক্তি। এই চুক্তির পর অনেকগুলো সম্ভাব্য যুদ্ধ এগিয়ে আসলেও শান্তিকামী সুলতান কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে যুদ্ধ এড়িয়ে যায়। ১৭৫৪ সালে সুলতান মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান মাহমুদ মৃত্যুবরণ করলে প্রাসাদের চার দেওয়ালে বড়ো হওয়া অযোগ্য তৃতীয় উসমান খলিফা হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিন বছর অতিবাহিত করার পর ১৭৫৭ সালে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। তবে এসময় রাজ্য পরিচালনা করত প্রধান উজির রাগিব পাশা। অতঃপর ১৭৫৭ সালে উসমানের বড়ো ভাই মোস্তফা খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান উজির রাগিব পাশা নতুন অস্ত্রাগার, কামান ঢালাই কারখানা, যুদ্ধ জাহাজ তৈরি, সেতু নির্মাণ, নৌ প্রশিক্ষণ, গোলন্দাজ বিদ্যার বিদ্যালয়, সামরিক বাহিনীর সকলের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রশাসনিক পুনর্গঠন, আর্থিক শৃঙ্খলা, ভূ-মধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মাঝে খাল নির্মাণের কাজ চালু, মক্কা-মদিনায় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করে যান। কিন্তু ১৭৬৩ সালে প্রধান উজির রাগিব পাশার মৃত্যুর পর সুলতান দুর্বল হয়ে পড়েন। সুলতান মোস্তফা তার শাসনামলে দুর্বল বাহিনী নিয়ে অনেক সাহসী অভিযানের সাময়িক সফলতা পেয়েছিলেন। কিন্তু তার এই পদক্ষেপসমূহের করুণ পরিণতি দেখার পূর্বেই ১৭৭৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান মোস্তফার মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম আব্দুল হামিদ ক্ষমতায় আসেন। সে ১৭৭৩ সাল হতে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত ১৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। নম্র স্বভাবের সুলতান শুরুতেই রাজকোষ ফাঁকা থাকায় হেঁচট খান। প্রথম আব্দুল হামিদ জানিসারিদের বেতন-ভাতা দিতে ব্যর্থ হন। তার



২২ সন্তানের ২১ জনই অল্প বয়সে বিভিন্ন রোগে মারা যায়। একমাত্র ফরাসি মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া দ্বিতীয় মাহমুদ বেঁচে যান, যে পরবর্তী সময়ে সুলতান হয়েছিলেন।

রাশিয়ার সাথে চলমান যুদ্ধেও ফলাফল হিসেবে তার শাসনামলের শুরুতেই দুই দেশের প্রধান উজিরের মধ্যস্থতায় ১৭৭৪ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু পুরো চুক্তিই ছিল অটোমানদের জন্য অবমাননাকর। ক্রিমিয়া, কৃষ্ণ সাগর ও ভূ-মধ্যসাগর তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে যায়। প্যালেস্টাইনের ভূমিতে প্রবেশাধিকার পায় রাশিয়ার প্রজারা। অটোমানদের অধিনে বসবাসরত সকল খ্রিষ্টানদের অভিভাবকত্ব লাভ করে রাশিয়া। অনেক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে উসমানি খিলাফতের পতনের প্রথম ধাপ ছিল এই চুক্তি।

১৭৮৭ সালে আবার রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ বেধে গেলে অ্যাডমিরাল হাসান তাদের প্রতিহত করতে যান। কিন্তু মহাশক্তিশালী রাশিয়ার নৌবাহিনীর সামনে উসমানি বাহিনী টিকতে পারেনি। ১৭৮৮ সালের মধ্য তুর্কিরা পূর্ব সীমান্তে পুরোপুরি পরাজিত হয়ে যায়। ১৭৮৯ সালে মার্শাল লুডন অস্ট্রিয় বাহিনীর নেতৃত্বে এসেই বসনিয়া, সার্বিয়া, মলদভা এবং দানিযুব ব-দ্বীপ দখল করে নেয়। যুদ্ধের শুরুতেই সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

### উসমানি খিলাফতের অধঃপতনের কারণ

মূলত এই খিলাফতের প্রাণশক্তি ছিল তার সুলতানরা। যতদিন সুলতানরা শক্তিশালী ছিল, তত দিন খিলাফত তার আদর্শ এবং শক্তি দিয়ে দুনিয়া শাসন করে চলেছে। যখন সেই প্রাণ শক্তিটা ফুরিয়ে এসেছে, তখনই মুখ খুবড়ে পড়েছে তাদের বিজয়রথ। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর অযোগ্য সুলতানরা নির্ভরশীল হয়ে পরে তাদের উজিরের ওপর। নিজেদের অবিচল আদর্শ, শক্তিমত্তা আর নৈতিক বল দিয়ে দুনিয়া শাসনের পরিবর্তে তারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে হেরেমের চার দেওয়ালের মাঝে। যোগ্য উজিরদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে খিলাফত কয়েক শতাব্দী চললেও দীর্ঘমেয়াদে তারা পিছিয়ে পরে অর্থনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা, আধুনিক সমরাস্ত্র ও রণকৌশলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এর ফলে তাদের একসময় নির্ভরশীল হতে হয় ইউরোপীয় শক্তির ওপর। তারা কখনো ফ্রান্সের সাথে, কখনো জার্মানির সাথে, কখনো-বা ইংল্যান্ডের সাথে মৈত্রী করে চলতে থাকে। সেনাবাহিনীকে ফরাসি আদলে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

## প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের পটভূমি (১২৯৯-১৫৫৬)

### পশ্চিমা আধুনিকীকরণের প্রভাব ও তানজিমাত আন্দোলন

তানজিমাত অর্থ সংস্কার বা পুনর্গঠন। ১৮৩৯ সালে তুরস্কে সুলতান প্রথম আব্দুল মজিদ কর্তৃক প্রবর্তিত পুনর্গঠন আন্দোলনকে তানজিমাত বলা হয়। যদিও রশিদ পাশা তানজিমাত আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সুলতান সুলাইমানের পর উসমানি খিলাফতে যে সার্বিক অধঃপতনের সূচনা হয়েছিল, সেখান থেকে আধুনিক যুগের সূচনার ক্ষেত্রে তানজিমাত প্রথম লিখিত দলিল, যা তুরস্কের পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। সতেরো শতকে তুরস্কের প্রতিবেশী ইউরোপে রেনেসাঁসের জন্ম। আঠারো শতকে পাশ্চাত্য জ্ঞানের মূল স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত এনলাইটমেন্ট-এর বিকাশ এবং ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ উসমানি খিলাফতে লাগে।

১৮৩৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তানজিমাত আন্দোলন শুরু হলেও সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় সেলিম ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় আহরণ করেই সংস্কার কাজে মনোনিবেশ করেছিল। তিনিও ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ— স্বাধীনতা, সাম্য ও ভাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ দেশে কাজ শুরু করেন। ইউরোপীয় ভাষা থেকে বহু বই তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করেন। ইউরোপীয় রাজনীতি, কূটনীতি, সমরনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য নিজ উদ্যোগে তরুণদের ইউরোপে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু এই সংস্কার কার্যক্রমে আঞ্জাম দিতে গিয়ে তিনি সেনাবাহিনীর জানিসারি ও আলেম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সংস্কার ইস্যুতে জানিসারি এবং আলেম সমাজের সাথে খারাপ সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় ১৮০৭ সালে তিনি সিংহাসনচ্যুত এবং ১৮০৮ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তার ভতিজা চতুর্থ মোস্তফা কয়েক মাসের জন্য সুলতান হলেও মাত্র এক বছরের মাথায় পদত্যাগ করেন।

১৮০৮ সালে দ্বিতীয় মাহমুদ ক্ষমতায় আহরণ করেন এবং পূর্ববর্তী সুলতানের ন্যায় তিনিও সংস্কার কার্যক্রম চালাতে থাকেন। সে সময়ে খিলাফতকে রাজনৈতিক অনাচার ও বর্বরতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করে সংস্কার কাজের প্রধান বাধা হিসেবে পরিচিত সেনাবাহিনীর জানিসারিদের সমূলে নির্মূল করেন। জানিসারি হলো খিলাফতের অগ্রগামী খ্রিষ্টান সৈন্য বাহিনী। ১৮২১ সালে গ্রিক স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে সংস্কার কাজ ব্যাহত হয়। তার শাসনামলে তুরস্ক কূটনৈতিক মিশনে অনেক এগিয়ে যায়। তার সময় Moniteur ottoman নামক পত্রিকা বের হতো। ১৮৩৪ সালে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে নীতি ও কর্মপরিকল্পনা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি পোস্টাল সার্ভিস চালু করেন।

সে সময় ফেস টুপির প্রবর্তন নিয়ে আলেম সমাজের সাথে দ্বন্দ্ব হলেও শেষ পর্যন্ত আলেমরা তা স্বীকৃতি দেয়। সামগ্রিকভাবে তার সময় প্রজাদের অসন্তোষ দূরীকরণ এবং প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করায় ঐতিহাসিকরা তাকেই মূলত উসমানি খিলাফতের তানজিমাত বা সংস্কারের পুরোধা হিসেবে মনে করেন।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের মৃত্যুর পর তার সন্তান প্রথম আব্দুল মজিদ ১৬ বছর বয়সে ক্ষমতায় বসেন। তিনি পিতার মতো বিচক্ষণ না হলেও অনেক আন্তরিক ও সচেতন ছিলেন। পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার চিন্তা নিয়ে শুরুতেই তিনি সে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রশিদ পাশাকে প্রধান উজির এবং নিজের মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। তার নেতৃত্বে ১৮৩৯ সালের ৩ নভেম্বর বিদেশি রাষ্ট্রদূত এবং দেশের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সামনে তানজিমাত পেশ করা হয়। তানজিমাতে জনগণের জীবন, সম্মান, সম্পত্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের সংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা, বাণিজ্য প্রথা, কর ব্যবস্থা, শিক্ষা সংস্কার, জেল সংস্কার, বিভিন্ন অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনসহ আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়। মূলত তানজিমাত ছিল আইনি, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারের প্রথম লিখিত দলিল। এই তানজিমাতের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— তারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দিয়েছিল। রাষ্ট্রের সকল জায়গায় সমানভাবে সকলে নিয়োগ পেত। এই সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—সবার চিন্তার জগতে পরিবর্তন এসেছিল। সে সময় শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে সুলতান অনেকগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার অন্যতম ছিল অটোমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও অনুদানের অভাবে বাস্তবে রূপ পায়নি। তবে সে সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিল। সরকার প্রদেশগুলোতে পাশা সিস্টেম উঠিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোটে দুইজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কয়েক বছর পর এতে ভালো সাড়া না পাওয়ায় সুলতান তা স্থগিত করে পাশাদের মজলিসের ব্যবস্থা করেন। ১৮৪৭ সালে বিচার বিভাগের জন্য নাগরিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে বিচারের ধারায় অনেক পরিবর্তন আনেন, যেখানে শরিয়তের পাশাপাশি ইউরোপিয়ান সিস্টেমকেও প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৪৪ সালে পুরাতন মুদ্রার পরিবর্তে ইউরোপিয়ানদের গোল্ড পাউন্ডের আদলে অটোমান মুদ্রা চালু করে। একই সময়ে সুলতান নতুন বাণিজ্যনীতি পাশ করেন। পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য ব্যবসা করা তখন অনেক সহজ হয়ে যায়।

সে সময় উসমানি খিলাফত সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেন। তুরস্কে ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পুঁজিবাদের ভিত্তিতে অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লোকের অভাব থাকায় সুলতান ১৮৫৮ সালের পর বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে বিদেশি রাষ্ট্রদূতেরা খিলাফত পরিচালনায় হস্তক্ষেপ শুরু করে।

অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে যাওয়ায় দ্রুত সর্বোত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যা দমন করতে সুলতান ছিলেন অক্ষম। ফলে দ্রুত সংস্কার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থনৈতিক এই সংকটের পরও সুলতান পুরাতন প্রাসাদের পরিবর্তে ইউরোপীয় ধাঁচে ‘দোলমা বাহচে’ নামক নতুন প্রাসাদের কাজ শেষ করেন, যা শুরু করেছিল তার বাবা দ্বিতীয় মাহমুদ। সম্পূর্ণ প্রাসাদ স্বর্ণ আর রূপা দিয়ে তৈরি করেন। প্রাসাদ নির্মাণে ফরাসি এবং ইতালিয়ান কারিগর ও নির্মাণ শিল্পীদের সহযোগিতা নেন। কাজ সম্পূর্ণ হলে সুলতান ৪০০ বছরের উসমানি খলিফাদের ঐতিহ্যের তোপকাপি প্রাসাদ ছেড়ে দোলমা বাহচেতে চলে আসেন।

১৮৬১ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে সুলতান আব্দুল মজিদ মৃত্যুবরণ করলে তার ভ্রাতা আব্দুল আজিজ সুলতান হন। অযোগ্য এবং আরামপ্রিয় সুলতানের কারণে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম দেখা দেয়। ১৮৭৬ সালের ৩০ মে প্রধান মুফতি, মন্ত্রিপরিষদ এবং সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সুলতানকে পদচ্যুত করে তার ভতিজা পঞ্চম মুরাদকে সুলতান বানান। কিন্তু নতুন সুলতান যুদ্ধবিদ্যায় ভীত হওয়ায় রাজসভা পরিচালনায় ব্যর্থ ছিলেন। সে সময় পাশা নামিক কামাল, মিখাত পাশা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন। নতুন সংবিধান প্রতিষ্ঠাসহ পাশাদের কতিপয় শর্তে রাজি হওয়ায় তারা ১৮৭৬ সালে পঞ্চম মুরাদকে পরিবর্তন করে দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ নতুন সুলতান হিসেবে শপথ দেন।

### ইয়াং তুর্কস মুভমেন্ট

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা গ্রহণ এবং ইউরোপীয় চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হয়ে উসমানি খিলাফতের মূল ভূখণ্ড তুরস্ককে ইউরোপের ধাঁচে গঠন করার পরিকল্পনা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মোহাম্মাদ বে এবং নামিক কামালের নেতৃত্বে ইয়াং তুর্কস নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের দাবি ছিল সাংবিধানিক সংস্কার আনয়ন। তানজিমাত আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও তুর্কিদের মধ্য যে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রক্ষাপটেই ইয়াং তুর্কস মুভমেন্ট বা তরুণ তুর্কি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৮৬১ সালে সুলতান আব্দুল মজিদ মৃত্যুবরণ করলে তার ভাই অযোগ্য শাসক আব্দুল আজিজ সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন। তার দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসনামলের (১৮৬১-১৮৭৬) সালের শেষ দিকে ১৮৭৬ সালে ইয়াং তুর্কস মুভমেন্ট বা তরুণ তুর্কি আন্দোলনের জন্ম হয়।

এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন নামিক কামাল ও মিখাত পাশা। কিন্তু পত্রিকায় সরকারবিরোধী কলাম লেখার অপরাধে ১৮৬৭ সালে ইউরোপে আত্মগোপন করেন এবং ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকতার পাশাপাশি নব্য তুর্কি আন্দোলন নিয়ে খিলাফতবিরোধী জনমত তৈরি করেন। ১৮৭৬ সালে সুলতান আব্দুল আজিজ পদচ্যুত হলে পুনরায় ইস্তান্বুলে ফিরে সংবিধান প্রণয়নে কাজ করেন। সুলতান আব্দুল হামিদের শাসনামলে তিনি পুনরায় বিতাড়িত হয়ে

১৮৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তরুণ তুর্কি আন্দোলনের অপর পরিচিত মুখ ছিলেন মিখাত পাশা। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। ১৮৫৮ সালে প্রধানমন্ত্রী রশিদ পাশার মৃত্যুর পর আলি পাশা নতুন প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি শুরুতেই মিখাত পাশাকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে পাঠান, যাতে করে ইউরোপীয় সরকারব্যবস্থার অবকাঠামো ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। ১৮৬৪ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনিও ইউরোপে ঘাঁচে তুরস্ক গঠন করতে কাজ শুরু করেন। ১৮৭২ সালে সুলতান আব্দুল আজিজ তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। মিখাত পাশা সংবিধান প্রণয়নের গোপন কমিটি গঠন করেছিলেন। ১৮৭৬ সালের সংবিধান প্রণয়নে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৮৭৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর সুলতান আব্দুল হামিদ মিখাত পাশাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উজির হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু ১৮৭৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তাকে পদচ্যুত করে দেশের বাহিরে পাঠিয়ে দেন। ব্রিটেনের চাপে দেশে ফিরিয়ে এনে ১৮৭৮ সালের ২২ নভেম্বর সিরিয়ার গভর্নর করে পাঠান এবং সেখানে ১৮৮১ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তাকে আইদিন প্রদেশের গভর্নর করে পাঠালেও মাত্র কয়েকদিন পরেই সুলতান আব্দুল আজিজ হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করে ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটেনের আপত্তির মুখে তার ফাঁসির দণ্ডদেশ তুলে নিলেও ১৮৮৩ সালের ২৬ এপ্রিল তিনি গুলি হত্যার শিকার হন।

### প্রথম সাংবিধানিক সময়কাল

১৮৩৯ সালে ‘তানজিমাত’ ছিল সংবিধান গঠনের প্রাথমিক ধাপ, যার লক্ষ্য ছিল ইউরোপ এবং পশ্চিমাদের ন্যায় উসমানি খিলাফতকে আধুনিকীকরণ করা। ১৮৬৩ সালে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত একদল তরুণ আর্মেনিয়ান তাদের জাতীর নিজস্ব সংবিধান তৈরি করে। এই আর্মেনিয়ান সংবিধানের প্রত্যেক প্রভাব পড়ে উসমানিদের প্রথম সংবিধানের ওপর। আধুনিক তুরস্ক গঠনের পূর্বে উসমানি খিলাফতের সুলতান আব্দুল হামিদের শাসনামলের পারশ্বে ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৬ সালে প্রথম সংবিধান গঠিত হয়। এই সংবিধানকে তর্কিশ ভাষায় বলা হয় ‘কানুন্নু ইসাস’ বা মৌলিক আইন।

এই সংবিধানের প্রণেতা ছিলেন মিখাত পাশা, যিনি ইয়ং অটোমানের সদস্য ছিলেন। যদিও সংবিধানের মূল লেখক ছিল আর্মেনিয়ান ক্রিকর অদিয়ান, যিনি মিখাত পাশার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। এই সংবিধানের আলোকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠিত হয়। উচ্চ কক্ষ বা মজলিশে আয়ান, যার সদস্যরা সুলতানের পছন্দমতো মনোনীত হতো। আর নিম্ন কক্ষ বা মজলিশে মেবুসান, যার সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতো। কিন্তু ১৮৭৮ সালে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর এই সংসদ স্থগিত হয়ে যায়। সংবিধানে ১২৯টি অনুচ্ছেদ ছিল; যেখানে তুরস্কের ভাষা, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, প্রধান উজির বা প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান মুফতি নিয়োগে সুলতানের

ক্ষমতা, মন্ত্রিসভা, সিনেট, জনপ্রতিনিধি, পরোক্ষ ভোট ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। উচ্চ কক্ষ বা মজলিশে আয়ানে ২৫ জন সুলতানের পছন্দের সিনেট সদস্য ছিল। নিম্ন কক্ষ বা মজলিশে মেবুসানে ১২০ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিল।

### দ্বিতীয় সাংবিধানিক সময়কাল

১৯০৮ সালের ২৩ জুলাই এ সংবিধান প্রণয়নে সুলতান আব্দুল হামিদকে বাধ্য করতে মেসোডনিয়া থেকে সেনাবাহিনীসহ তরুণ তুর্কি এবং কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস ইস্তানবুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেসময় সুলতানের আলবেনীয় দেহরক্ষীরা বিপ্লবীদের সাথে যোগ দেয়। অবশেষে সুলতান বাধ্য হয়ে তাদের দাবি মেনে নিয়ে ১৯০৮ সালের ২৪ আগস্ট পুনরায় সংবিধান প্রবর্তন করেন। মূলত ১৯০৮ সালকে তরুণ তুর্কিদের বিপ্লবের বছর বলা হয়। এই সংবিধান অনুযায়ী উসমানি খিলাফতে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস এবং ইউনোনিষ্ট সংগঠন মেজরিটি আসনে বিজয়ী হয়। ৩০ জানুয়ারি ১৯০৯ সালে তাদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস এবং সাধারণ জনগণের মাঝে সম্পর্ক ভালো থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা নষ্ট হয়ে যায়। ১৯০৯ সালে এপ্রিল মাসে সাধারণ জনতা খিলাফতের পক্ষে রাস্তায় নামলে সুলতান পুনরায় সমস্ত ক্ষমতা ফেরত নেন। কিন্তু ২৪ এপ্রিল ১৯০৯ সালে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মাহমুদ শওকত পাশা সুলতান আব্দুল হামিদকে পদচ্যুত করে পঞ্চম মাহমুদকে ক্ষমতায় বসায়। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ২২টি সরকার গঠিত হয়। তারা শাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হলে ১৯১৮ সালে ষষ্ঠ মাহমুদ ক্ষমতায় এসে তাদের পদচ্যুত করেন।

এই দীর্ঘ সময়ে কেন তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন? ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান পাশা বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণির সাথে প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তারা ভালোভাবে কাজ করতে পারেননি। দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা তুরস্কের রক্ষণশীল জনগণ ইউরোপিয়ান সংস্কৃতিকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। তুরস্কের আলেম সমাজ বরাবর এই সংস্কার কাজে বাধা প্রদান করে আসছিলেন। নব্য তুর্কিদের মাঝে অভ্যন্তরীণ মত-পার্থক্যও বিদ্যমান ছিল। তারা একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। পরস্পরবিরোধী মত-পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব সবসময় লেগেই ছিল। তার ওপর তারা বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা ও বর্ণের মানুষ হওয়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারেনি। তারা শাসন ক্ষমতার শুরু থেকেই একাধিক বলকান যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুনিয়ার বড়ো শক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ায় তারা তুরস্কের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সফল হতে পারেনি।

### বলকান যুদ্ধ

জাতি রাষ্ট্র সূচনার পারশ্বে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠনের যে ঢেউ উঠে, তার একটা বড়ো ধাক্কা লাগে উসমানি খিলাফতের ওপর। তরুণ তুর্কিদের শাসনামলে তাদের তর্কিশ জাতীয়তাবাদী নীতির কারণে বলকানের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। জাতিগত ও সাংস্কৃতিক মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার প্ররোচনায় গ্রিস প্রধানমন্ত্রী ভিনিজোলস-এর নেতৃত্বে গ্রিস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং মন্টিনেগ্রো ‘দ্য বলকান লিগ’ নামক একটি সামরিক জোট গঠন করে, যারা ১৯১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর খিলাফতের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। যুদ্ধে কৌশলগত ভুলের কারণে উসমানিরা পরাজিত হয়। যুদ্ধের পর ১৯১৩ সালের লন্ডন বৈঠকের মাধ্যমে কতিপয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইস্তান্বুল ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ উসমানি খিলাফতের হাতছাড়া হয়ে যায়। আলবেনিয়া প্রথমে তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত হিসেবে থাকলেও পরে স্বাধীন হয়ে যায়। এ ছাড়া গ্রিস মেসোডোনিয়ার একাংশসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখলে নেয়।

লন্ডন বৈঠকের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও উসমানি খিলাফত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বিভিন্ন অঞ্চলের ভাগাভাগি নিয়ে গ্রিস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং মন্টিনেগ্রোর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। আলবেনিয়া স্বাধীন হওয়ায় তাদের সমুদ্র বাণিজ্য ব্যহত হয়। এ কারণে সার্বিয়া আলবেনিয়ার কিছু অংশ দখল করে। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং ইতালি সার্বিয়ার এ কাজে বাধা প্রদান করে। সার্বিয়ায় বুলগেরিয়ার সমুদ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে বুলগেরিয়া ১৯১৩ সালের ২৯ জুন গ্রিস ও সার্বিয়া আক্রমণ করে। রোমানিয়া বুলগেরিয়ার কিছু অংশ দাবি করলে রোমানিয়ার সাথেও যুদ্ধ বেঁধে যায়। বলকান অঞ্চলের দেশসমূহের অন্তঃকোন্দল চলা অবস্থায় অটোমানরা ইস্তান্বুলের আশেপাশে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের তাদের হারানো কয়েকটি অঞ্চল পুনরায় দখল করে নেয়। যুদ্ধে গ্রিস, সার্বিয়া, রোমানিয়া, মন্টিনেগ্রো এবং তুরস্ক বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে রোমানিয়ার সৈন্যরা বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া দখলের দিকে অগ্রসর হলে বুলগেরিয়া যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়। ফলে ১৯১৩ সালের ১০ আগস্ট বুখারেস্ট চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধ স্থগিত হয়। যুদ্ধে উসমানিদের সমর্থিত অঞ্চলের বিজয়ে কিছুটা হলেও বলকানে উসমানি খিলাফতের ইতিবাচক প্রভাব বজায় থাকে।

### প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও উসমানি খিলাফত

বলকান যুদ্ধসহ তার পূর্বে আরও সৃষ্ট কিছু ঘটনায় এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্য সম্পর্ক যেমন ভালো যাচ্ছিল না, তেমনি এই অঞ্চলের সাথে অস্ট্রিয়া, জার্মানির সম্পর্কও খারাপ যাচ্ছিল। ১৯১৪ সালের ২৮ শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড বসনিয়ার রাজধানী সারায়েফতে ঘুরতে এসে সার্বিয়ার আতাতায়ীদের হাতে নিহত হয়। ঘটনার পরেই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সার্বিয়ার পক্ষে রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জাপান, ইতালি, চীন এবং আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

জার্মানি অস্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। আগস্ট জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে এবং ৩ আগস্ট ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামে প্রবেশ করলে ব্রিটেন বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষায় ৪ আগস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তুরস্ক প্রথমদিকে নিরপেক্ষ থাকলেও তরুণ তুর্কি নেতা আনোয়ার পাশা গোপনে জার্মানির সাথে চুক্তি করে। ১৯১৪ সালের ১ নভেম্বর তুরস্ককেন্দ্রীয় শক্তি তথা জার্মান, অস্ট্রিয়া এবং ইতালির পক্ষে যুদ্ধে নেমে পড়ে। ১৯১৪ সালে আনোয়ার পাশা ককেশাস অঞ্চলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শীতকালীন অভিযানে পুরো তুরস্ক সেনাবাহিনী হারিয়ে ফেলে। জামাল পাশা সুয়েজখাল অভিযানে বের হয়ে ব্রিটিশদের মুখোমুখি হলে কেন্দ্রে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। বাগদাদ মিত্রবাহিনীর হাতে চলে যায়। আরব অঞ্চল মক্কার গভর্নর হোসাইনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্রিটিশদের সাথে হাত মিলিয়ে জয়লাভ করে। তবে ১৯১৫ সালে একমাত্র চানাক্কালের যুদ্ধক্ষেত্রে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে উসমানি বাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৯১৮ সালের ৩০ অক্টোবর ‘মুদরুস’ চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে উসমানিরা খিলাফতের হেজাজ বা সমগ্র আরব, সিরিয়া, মেসপটমিয়াসহ বড়ো অংশ হারিয়ে ফেলে। ১৯১৮ সালের ১ নভেম্বর তুরস্ককে যুদ্ধে জড়ানোর মূল নায়ক তরুণ তুর্কি নেতা আনোয়ার পাশা জার্মানিতে পালিয়ে যায়।

### চানাক্কালে যুদ্ধ

তুরস্কের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হচ্ছে চানাক্কালে যুদ্ধ। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলা অবস্থায় ইংল্যান্ডের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে তুরস্কের চানাক্কালে প্রদেশে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি হতে ১৯১৬ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও ফ্রান্স ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অবস্থা নিয়েছিল। ব্রিটিশরা আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে গ্যালিপলিতে আগমন করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গ্যালিপলি তথা চানাক্কাল দিয়ে প্রবেশ করে মর্মর সাগর পাড়ি দেবে। তারপর বসফরাস প্রণালী দিয়ে ইস্তানবুল বিজয় করে তাদের মিত্র শক্তি রাশিয়াকে যুদ্ধ সরাজ্জাম সরবরাহ করবে। তবে ইংরেজদের সে আশা ধুলোয় মিশে দেয় উসমানি সৈন্যরা। ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয় ও ফরাসি সাম্রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনীর আনুমানিক ৫ লাখ ৫ হাজার সৈন্য নিহত হয়। তবে এই যুদ্ধে চানাক্কালে স্পটে বেশিরভাগ সৈন্যরা ছিল অস্ট্রেলীয়ান। উসমানীয়রা তাদের নৌ শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সেনাপতি মোস্তফা কামাল তুরস্কের জাতীয় বীরে পরিণত হয়। চানাক্কালের যুদ্ধের সাথে আরেকটি নাম অনেক বেশি জড়িত, তিনি হলেন সেইত অনবাসি। যদিও তার আসল নাম হচ্ছে সেইত আলি চাবুক। ঐতিহাসিকদের মতে ১৯১৫ সালে চানাক্কালে যুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীর নৌযানগুলো গ্যালিপলি পার হওয়ার সময় সেইত অনবাসি ২৫০ কেজি ওজনের কামানের গোলা বহন করে কামানে স্থাপন করেছিলেন। এই দুঃসাহসিক বীরত্বের জন্য তুরস্কের জনগণ তাকে মহান বীর হিসেবে স্মরণ করে।



আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল আতাতুর্কের বীরত্ব নিয়ে লিখতে গিয়ে বললেন,

‘ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,

অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই...’

স্বাধীনতার আশায় ভারতের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই চুক্তি অনুসারে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উসমানি খিলাফত যখন যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিলো, ঠিক তখনই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে গভীর দ্বিধা ও সংশয় দেখা দেয়। মুসলমান হয়ে তারা তুরস্কের মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাও আবার তুরস্কের খলিফা, যিনি সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক!

এসময় ভারতে দায়িত্বরত ব্রিটিশ অফিসাররা মুসলমান আলেমদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যুদ্ধে যাই হোক না কেন বৃহত্তর আরব অঞ্চলে মুসলমানদের ধর্মীয় স্থানসমূহ অক্ষত থাকবে। তারপরেও মুসলমানরা যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তাদের ওপর নেমে আসে বিভিন্ন রকম নির্যাতন। অসংখ্য মুসলমান বাধ্য হয়ে যুদ্ধে গেলেও পরে পালিয়ে আসে। অনেকে যুদ্ধে অংশ না নিয়ে কঠিন নির্যাতনের মুখোমুখি হয়।

ব্রিটিশ বিরোধীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা হয়। মুসলমানের তৎকালীন নেতা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত *আল-হেলাল* পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে যতদিন যুদ্ধ চলেছিল, তত দিন মাওলানা কালামকে করাচিতে অন্তরীণ করে রাখা হয়। শওকত আলির ভাই মাওলানা মুহাম্মদ আলি তুরস্কের জার্মানির পক্ষে যোগ দেওয়াকে সমর্থন করে তাঁর *কমরেড* পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই অপরাধে *কমরেড* পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাকে ও তাঁর ভাই শওকত আলিকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। যুদ্ধের পর মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলন শুরু করে।

### সেভার্স চুক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি খিলাফতের পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি তুরস্কের ওপর একটি চুক্তি চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরাজিত তুরস্ককে কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনার সুযোগ না দিয়ে যুদ্ধকালীন গোপন চুক্তি অনুযায়ী তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলকে নিজেদের মধ্যভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট মিত্রশক্তি ও তুরস্কের মধ্য এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৩ খণ্ডে বিভক্ত এই চুক্তিতে ৪৩৩টি ধারা আছে যা ছিল তুরস্কের জন্য চরম ক্ষতিকর। এই চুক্তির কিছু ধারা এমন—

- চুক্তির প্রথম খণ্ডে (১-২৬ নং ধারা) লিগ অব নেশন-এর কিছু বিষয় যুক্ত ছিল।
- দ্বিতীয় খণ্ড (২৭-৩৫ নং ধারা) ছিল সীমানা সংক্রান্ত। এই চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক ভৌগোলিকভাবে ছোটো হয়ে যায়। যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৪ সালে তুরস্কের আয়তন ছিল প্রায় ৬,১৩,৫০০ বর্গ মাইল। যুদ্ধের পর বিভিন্ন অঞ্চল হারিয়ে তুরস্কের আয়তন হয় মাত্র ১,৭৫,০০০ বর্গমাইল। সেইসঙ্গে জনসংখ্যা দুই কোটি থেকে কমে মাত্র ৮-১ লাখে চলে আসে।
- চুক্তির তৃতীয় খণ্ড (৩৬-১৩৯ নং ধারা) ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড সংক্রান্ত রাজনৈতিক রূপরেখা। কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তানবুলের ওপর তুরস্কের অধিকার স্বীকৃত হয়। দার্দানেলিস, বসফোরাস ও মার্মারা সাগরে সকল দেশের বানিজ্যিক ও যুদ্ধ জাহাজ বিনা বাধায় চলাচল করতে পারার স্বীকৃতি সেখানে সংযোজিত হয়। কুর্দি অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়। এরজুরুম, বিতলিস ও ভান প্রদেশ নিয়ে স্বাধীন আর্মেনিয়া গঠনে তুরস্ক কর্তৃক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়। তুরস্ক সুদান, মিসর, সাইপ্রাসসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে তাদের অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মরক্কো ও তিউনিশিয়াকে ফরাসি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বর্তমান ইজমিরসহ উদ্ধারকৃত অঞ্চলগুলো গ্রিসকে দিয়ে দেওয়া। সমগ্র আরব ও সিরিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স দখল করে নেয়। চুক্তি অনুসারে তুরস্ক এই অঞ্চলে তাদের অধিকার ত্যাগ করে। এই চুক্তির ফলে বর্তমান ইরাক এবং ফিলিস্তিনের ওপর তুরস্কের অধিকার হারিয়ে যায়। ব্রিটিশরা তা দখল করে নেয়। আদানাসহ আশেপাশের প্রদেশগুলোতে ফরাসি আধিপত্য স্বীকৃত হয়।
- চুক্তির চতুর্থ খণ্ড (১৪০-১৫১ নং ধারা) অনুযায়ী তুরস্কে অবস্থানরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সংখ্যালঘুদের অধিকার মেনে নেওয়া হয়।
- চুক্তির পঞ্চম খণ্ড (১৫২-২০৭ নং ধারা) অনুযায়ী তুরস্কের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু তাদের সদস্য সংখ্যা ৫০,০০০-এর বেশি হবে না।
- চুক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড (২০৮-২৩০ নং ধারা) অনুযায়ী যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয় স্বীকৃত হয়। চুক্তি অনুযায়ী তুরস্কের হাতে বন্দিদের ফেরত এবং তাদের যাতায়াত খরচ বহন, বিভিন্ন দেশে তুরস্কের অভিযুক্ত সৈন্যদের সেই দেশের আদালতে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।
- চুক্তির অষ্টম খণ্ড (২৩১-২৬০ নং ধারা) অনুযায়ী ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি তুরস্কের বাজেট, মুদ্রা, কর ও বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করবে।
- চুক্তির নবম খণ্ড (২৬১-৩১৭ নং ধারা) অনুযায়ী তুরস্ক ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালিকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য থাকবে এবং তাদের নাগরিকদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে।

- চুক্তির দশম খণ্ড (৩১৮-৩২৭ নং ধারা) অনুযায়ী মিত্র শক্তির দেশসমূহকে স্বাধীনভাবে বিমান চলাচলে সুযোগ দিতে হবে।
- চুক্তির এগারো খণ্ডের (৩২৮-৩৭৩ নং ধারা) অনুযায়ী মিত্র শক্তির দেশসমূহকে স্থল ও জলপথে বিনা শুল্কে মালামাল পরিবহনের সুযোগ দিতে হবে।
- দ্বাদশ খণ্ড (৩৭৩-৪৩৩ নং ধারা) অনুযায়ী শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা ও মজুরি নির্ধারণ করা হয়।
- ত্রয়োদশ খণ্ড (৩৭৪-৪৩৩ নং ধারা) অনুযায়ী অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তি যে চুক্তি করবে, তুরস্ক সেখানেই স্বাক্ষর করবে।

সুলতান ষষ্ঠ মোহাম্মাদের নির্দেশে উসমানিরা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও তরুণ তুর্কিদের অনুসারী সেনাবাহিনী তা মেনে নেয়নি। সে সময়ে চানাকালে যুদ্ধের বিজয়ী নায়ক কামাল আতাতুর্ক এই চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তুরস্কের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে ১৯২৩ সালে পুনরায় লুজান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

### আরবদের বিদ্রোহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলা অবস্থায় ব্রিটিশদের সাথে হাত মেলানোর কারণে সৌদি বা হিজাজের মুসলমানদের সাথে খিলাফতের বিদ্রোহ ছিল উসমানিদের জন্য এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। আরবদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আজও তর্কিশরা তাদের ক্ষমা করতে পারেনি। ১৯১৩ সালে সৌদিরা উসমানীয় সৈন্যদের কাছ থেকে পূর্ব আরবের গুরুত্বপূর্ণ মরুদ্যান হাসা শহর দখল করে নেয়। এরপর পার্শ্ববর্তী কাতিফ শহরও সৌদিরা দখলে নেয়। পরের বছর ১৯১৪ সালে বিশ্বজুড়ে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটিশরা শেখপিয়ারের মাধ্যমে রিয়াদে সৌদিদের সাথে উসমানিদের অনুগত রাশিদিদের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে সংঘটিত এই যুদ্ধে রাশিদিরা জয়ী হয় এবং শেখপিয়ারকে হত্যা করে। রাশিদিরা শেখপিয়ারের শিরোচ্ছেদ করে এবং তার হেলমেট উসমানীয়দের কাছে হস্তান্তর করে। উসমানীয়রা সৌদিদের সাথে ব্রিটিশদের সম্পর্কের প্রমাণ স্বরূপ শেখপিয়ারের হেলমেট মদিনার প্রধান ফটকে ঝুলিয়ে দেখায়।

শেখপিয়ারকে হারিয়ে বিপর্যস্ত ইবনে সৌদ ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশদের সাথে দারিন চুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্রিটিশদের পক্ষে ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্য প্রধান মেজর জেনারেল স্যার পার্সি কক্স ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি মোতাবেক সৌদি রাজত্ব ব্রিটিশদের করদরাজ্য (Protectorate)-এ পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মান-উসমানীয় খিলাফতের দুর্বল অবস্থা ও আল-সৌদ পরিবারের সাথে ব্রিটিশদের সখ্য দেখে চিন্তিত হয়ে উঠেন মক্কার উসমানীয় সমর্থিত শাসক হুসাইন বিন আলি। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মদদে মক্কার শাসক সেই হুসাইন বিন আলি উসমানীয়দের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ তৈরি করে। মক্কার গভর্নর শরিফ হোসাইন ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রতিনিধি থমাস এডওয়ার্ড লোওয়ার্ডের সাথে গোপন চুক্তি করেন,

যেখানে বলা হয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে সমগ্র আরবের খলিফা বানানো হবে। ১৯১৫ সালের ২৪ অক্টোবর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাকে শরিফ-ম্যাকমোহন চুক্তি বলা হয়। এই চুক্তিতে আরব ব্যতীত বাকি অঞ্চল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্য ভাগাভাগি হয়। এখানে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের ভূখণ্ড প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিও সম্পাদিত হয়।

### মরুভূমির বাঘ ফখরুদ্দিন পাশার বীরত্ব

ব্রিটেন ও আরবের শরিফ বাহিনীর বিরুদ্ধে যিনি উসমানীয় সেনাবাহিনীর সেনানায়ক ও মদিনার গভর্নর হিসেবে প্রাণপণ লড়াই করেছেন, তিনি হলেন ফখরুদ্দিন পাশা। মদিনা রক্ষার জন্য তিনি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছেন। তর্কিশরা তাকে Fahrettin paşa বলে ডাকে। তাঁর মূল নাম Ömer Fahrettin Türkkan। ফখরুদ্দিন পাশা ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। মদিনার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও সাহসিকতার জন্য ব্রিটিশরা তাকে ‘মরুভূমির বাঘ বা Tiger of Desert’ নামে ডাকে। ২০১৭ সালে আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে কাবা শরিফের সম্পদ লুণ্ঠনকারী বললে এটা নিয়ে তুরস্ক এবং আরব আমিরাতে চরম বিতর্ক তৈরি হয়। উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিজেক তাইয়্যপ এরদোয়ান ফখরুদ্দিন পাশার নামে মিথ্যাচার করায় বিভিন্ন সমাবেশে আরব আমিরাতের তীব্র নিন্দা করেছেন।

ফখরুদ্দিন পাশা যুদ্ধ একাডেমিতে যোগ দিয়ে ১৮৮৮ সালে স্নাতক সম্পূর্ণ করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে পূর্বাঞ্চলে আর্মেনিয়ার সীমান্তে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইস্তানবুলে এসে ফার্স্ট রেগুলার আর্মিতে যোগ দেন। ১৯১১-১২ সময়কালে তাকে লিবিয়া প্রেরণ করা হয়। বলকান যুদ্ধ শুরু হলে তিনি চানাক্কালে অবস্থান নেওয়া ৩১তম ডিভিশনের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার সেনা ইউনিট বুলগেরিয়ার কাছ থেকে এড্রিনোপল (যা বর্তমানে তুরস্কের এড্রিন প্রদেশ) ছিনিয়ে নেয় এবং তিনি আনোয়ার পাশার সাথে শহরে প্রবেশ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১৯১৪ সালে উসমানীয়দের সেনা সমাবেশের আগে স্টাফ কর্নেল ফখরুদ্দিন মসুলে কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯১৪ এর ১২ নভেম্বর তিনি মিরলিভা পদে উন্নীত হন এবং আলেক্সান্দ্রে অবস্থানরত ফোর্থ আর্মির ডেপুটি কমান্ডার হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৬ সালের ২৩ মে জামাল পাশার আদেশে তিনি মদিনার প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে হেজাজে রওনা হন। ১৭ জুলাই তাকে হেজাজ এক্সপেডিশনারি ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশদের সহযোগিতায় আরবরা ফখরুদ্দিন পাশাকে ঘিরে ফেললেও তিনি কঠোরভাবে পবিত্র শহরের প্রতিরক্ষা করে যান। তাকে মদিনার প্রতিরক্ষার সাথে সাথে হেজাজ রেলওয়ের সুরক্ষার দিকটাও দেখতে হতো। টি ই লরেন্স ও তার আরব সেনারা এ রেলপথের ওপর হামলা চালাচ্ছিল। এ রেলপথের ওপর তাঁর সামগ্রিক সরবরাহ নির্ভর করছিল। বিচ্ছিন্ন এই ক্ষুদ্র ট্রেন স্টেশনের নিরাপত্তার জন্য নিয়জিত তুর্কি সেনা ছাউনি বেশ কিছু রাত্রিকালীন আক্রমণ রুখে দেয়। তারা সফলভাবে রেলপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

উসমানীয় ও মিত্রপক্ষের মধ্যে মুদরোসের চুক্তির পর আশা করা হচ্ছিল যে, ফখরুদ্দিন পাশা আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করেন এবং যুদ্ধবিরতি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ১৯১৮-এর বসন্তের এক শুক্রবারে মসজিদে নববিতে নামাজের পর তিনি মিসরের অর্ধেক অংশে উঠেন এবং নবির কবরের দিকে মুখ করে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—

‘আল্লাহর রাসুল, আমি কখনো আপনাকে ছেড়ে যাব না। হে সৈনিকেরা, প্রিয় নবিজিকে সাক্ষী রেখে আমি তোমাদের প্রতি আবেদন করছি। আমি নির্দেশ দিচ্ছি, শত্রু সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, শেষ গুলি ও শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাকে এবং তাঁর শহরকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুক। মুহাম্মদ (সা)-এর দুআ আমাদের সাথে আছে...’

ফখরুদ্দিন পাশা বলেছিলেন যে, তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন। সেখানে মুহাম্মদ (সা) তাকে আত্মসমর্পণ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯১৮-এর আগস্টে শরিফ হুসাইন বিন আলি তাকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানালে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান। উসমানীয় যুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি আদেশ আসার পরও তিনি তলোয়ার ফেলে দিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর আচরণে উসমানীয় সরকার বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ তাকে পদচ্যুত করেন। তিনি আদেশ মানতে অস্বীকার করেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৭২ দিন পর পর্যন্ত উসমানীয় পতাকা সমুন্নত রাখেন। ফখরুদ্দিন পাশা তাঁর নিজের লোক কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। আত্মসমর্পণের পর আবদুল্লাহ বিন হুসাইন মদিনা প্রবেশ করেন এবং তার ভাই আলি বিন হুসাইন ২ ফেব্রুয়ারি শহরে প্রবেশ করেন।

গ্রেপ্তারের পর তাকে মিসরের কায়রোতে সেনাবাহিনীর ব্যারাকে আনা হয়। পরে তাকে মাল্টায় পাঠানো হয়। ১৯২১ সাল পর্যন্ত দুই বছর তিনি মাল্টায় যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক ছিলেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তির পর তিনি কামাল আতাতুর্কের অধীনে তুর্কি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং আনাতোলিয়া দখলকারী গ্রিক ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তিনি ১৯২২ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত কাবুলে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান এবং সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। ১৯৪৮-এর ২২ নভেম্বর এক্সিশেহিরে একটি ট্রেন ভ্রমণের সময় হার্ট এটাকের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার ইচ্ছা অনুযায়ী ইস্তানবুলের আশিয়ান আসরি সেমেট্রিতে তাকে দাফন করা হয়।

### মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর তুরস্কের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় ১৯১৮-১৯২৪ সাল পর্যন্ত মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে অনেকগুলো বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়, অবমাননাকর মুদরুস চুক্তি, প্রভাবশালী তিন পাশার পলায়ন এবং ১৩ নভেম্বর ১৯১৮ সালে মিত্রশক্তির ৬০টি জাহাজ ইস্তানবুলে নোঙর করার ফলে বাহ্যত ইস্তানবুলের ওপর শত্রুপক্ষের

পূর্ণনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। ফ্রান্স বাহিনী তুরস্কের মূল ভূখণ্ডের আদানা, আফিয়নের দিকে অভিযান চালায়। পূর্ব দিকে আর্মেনিয়া ও আনতালিয়ায় ইতালি বাহিনী এবং ইজমির বা স্মার্না অঞ্চলে মিত্র বাহিনীর জাহাজ ও তুরস্কের প্রজারষ্ট্র গ্রিস দুকে গণহত্যা চালায়, যা তুরস্কবাসী মেনে নিতে পারেনি। খিলাফতের এমন পরিস্থিতিতে সুলতান আপস নীতি গ্রহণ করে যুদ্ধের ব্যর্থতার দায় তরণ তুর্কি নেতাদের ওপর চাপিয়ে তাদের সংগঠন ‘কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস’-কে নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু সুলতানের আপাসনীতির কারণে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সুলতান অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য মোস্তফা কামালকে দায়িত্ব দিয়ে আনতালিয়ায় পাঠান। কিন্তু তিনি সুলতানের নির্দেশ অমান্য করে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

মোস্তফা কামাল ১৯১৯ সালের ৩ মার্চ এরজুরুমে অনুষ্ঠিত ‘পূর্ব আনাতোলিয়ার অধিকার রক্ষা সমিতি’র সদস্যপদ গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই ১৯১৯ সালের ১৯ জুন আমাসিয়া কংগ্রেস, ২৩ জুলাই এরজুরুম কংগ্রেস, ৮ সেপ্টেম্বর সিভাস কংগ্রেস এবং ১১ সেপ্টেম্বর ২য় আমাসিয়া কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; যা ছিল সম্মিলিত বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য প্রথম রাজনৈতিক পদক্ষেপ। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে তুরস্কে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কামাল আতাতুর্কের সমর্থিত জাতীয়তাবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এর মধ্য দিয়েই সমগ্র তুরস্কে সুলতানের প্রভাব কমতে থাকে এবং আতাতুর্কের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল আংকারায় জাতীয় সংসদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ইস্তান্বুল থেকে পালিয়ে আসা ১০০ জন সংসদ সদস্য এবং বিভিন্ন স্থান হতে নির্বাচিত ১৯০ জনসংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। মোস্তফা কামাল এই সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এখান থেকেই জনগণকে ইস্তান্বুলের পরিবর্তে আংকারার সরকারের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯২০ সালের ১১ মে ইস্তান্বুলে সুলতানের নির্দেশে বিশেষ সামরিক আদলতে আতাতুর্কের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আংকারার ১৫২ জন মুফতি ঘোষণা করেন যে, এই ফতোয়ার কোনো বৈধতা নেই।

আংকারায় প্রতিষ্ঠিত আতাতুর্কের শক্তিশালী বাহিনী আর্মেনিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রিস ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। ১৯২০ সালে ফরাসি বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের আলেপ্পোতে পিছু হটাতে সক্ষম হয়। ফ্রান্স ৩০ মে আংকারায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯২০ সালের ৩ ডিসেম্বর আলেকজান্দ্রেপল চুক্তির মাধ্যমে আর্মেনিয়ার বৃহৎ অংশ তুরস্ক ফিরে পায় এবং ১৯২১ সালের ১৩ মার্চ ইতালির সাথে চুক্তি করে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করায়। ১৬ মার্চ রাশিয়ার সাথে চুক্তি করে বিবাদমান সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রিকদের সাথে সাকারিয়াত যুদ্ধে তুরস্ক বিজয় লাভ করে। ৯ সেপ্টেম্বর ইজমিরে গ্রিকদের পরাজিত করার মাধ্যমে সমগ্র আনাতোলিয়ায় আতাতুর্কের জাতীয়তাবাদীদের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। এক দিকে সুলতানের ব্যর্থতা অপরদিকে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে কামাল আতাতুর্ক বিজয়ী হয়ে তুরস্কের ভূখণ্ড রক্ষার মাধ্যমে জাতীয় বীরে পরিণত হয়। মূলত দেশের ভূখণ্ড এবং স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে অসামান্য অবদানের কারণে অদ্যবধি তুরস্কের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে কামাল আতাতুর্ক এক জনপ্রিয় ব্যক্তির নাম।

### লুজান চুক্তি

তুরস্কের সাথে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ইতালির সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯২২ সালের ২১ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে এক সম্মেলন শুরু হয়। তুরস্কের পক্ষ হতে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের আস্থাভাজন ইসমত ইনু প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। প্রোগ্রামে ইসমত ইনু তুরস্কের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী সকল প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর ৪ ফেব্রুয়ারি ইসমত ইনু আংকারায় ফিরে আসেন এবং ২৩ এপ্রিল পুনরায় সম্মেলনে যোগদান করেন। দীর্ঘ তিন মাস আলোচনার পর ২৪ জুলাই ১৯২৩ লুজান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে সর্বমোট ১৪৩টি ধারা ছিল। উল্লেখ্যযোগ্য ধারাসমূহ হলো—

- চুক্তি অনুযায়ী মিত্রবাহিনীর সাথে তুরস্কের শান্তি স্থাপিত হবে এবং সকলে তুরস্কের সার্বভৌমত্ব মেনে নেবে।
- সেইসঙ্গে তুরস্ক ও আরব অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব মেনে নেবে।
- তুরস্ক মিসর ও সুদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ করবে।
- তুরস্কের বসফরাস প্রণালীর ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে ট্যাক্স ছাড়াই জাহাজসমূহ চলাচল করতে পারবে।
- তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে সম্পাদিত পৃথক এক চুক্তিতে তুরস্কে অবস্থানরত গ্রিক সংখ্যালঘু এবং গ্রিসে অবস্থানরত তর্কিশ সংখ্যালঘুদের বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। সে সময় ১৩,৫০,০০০ গ্রিক তুরস্ক থেকে গ্রিসে যায় এবং ৪৩,২০০ তুর্কি মুসলিম মেসোডোনিয়া থেকে তুরস্কে আসে।
- চুক্তি অনুযায়ী সাইপ্রাস ব্রিটেনের অধিনে যায়।
- তুরস্ককে সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

### খিলাফতের সমাপ্তি

১৯২২ সালের ১ নভেম্বর জাতীয় সংসদ তুরস্কের সালতানাতকে বিলুপ্তি ঘোষণা করে। সুলতান মোহাম্মাদকে সরিয়ে তার চাচাতো ভাই আব্দুল মজিদকে সুলতান ঘোষণা করা হয়। তবে তার ক্ষমতা শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ১৯২৩ সালের ১১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ আংকারাকে তুরস্কের রাজধানী ঘোষণা করে। ২৯ অক্টোবর তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। কামাল আতাতুর্ক প্রেসিডেন্ট এবং ইসমত ইনু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ সংসদ খিলাফতকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। পরেরদিন সুলতান আব্দুল মজিদ ইস্তানবুল ত্যাগ করেন। ফলে ৬৩৬ বছরের উসমানি খিলাফতের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। এই ঘটনার পর থেকে কামাল আতাতুর্কের ব্যাপারে যথেষ্ট সমালোচনা শুরু হলেও রাষ্ট্রীয় শক্তির ভয়ে কেউ কথা বলার সাহস করেনি। খিলাফতের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটল। বসফরাসের তীরে এক নতুন তুরস্কের আবির্ভাব হলো।

## উসমানি খিলাফতের ঢেউ লেগেছিল ভারতীয় উপমহাদেশেও

সুলতান সেলিমের (১৭৮৯-১৮০৭) সময় থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানেরা উসমানি খিলাফতকে তাদের মুসলিম ঐক্যের প্রতীক মনে করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর ১৯১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিল্লিতে ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ’-এর সম্মেলনে শেরে বাংলা এক ফজলুল হক ব্রিটিশদের সমালোচনা করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশদের হাত থেকে উসমানি খিলাফতকে রক্ষা করতে ভারতীয় উপমহাদেশে খিলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত উসমানি খিলাফতের শেষ সময়ে ১৯১৯-১৯২২ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলনের সময়সীমা ছিল। উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯) প্যান-ইসলামিক কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), তুরস্কের ওপর ইতালীয় ও বলকান আক্রমণ এবং তুরস্কের বিপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের অংশগ্রহণের ফলে বিশ শতকের শুরুতে প্যান-ইসলামিক আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় এবং সেভার্স চুক্তির (আগস্ট ১০, ১৯২০) অধীনে তুরস্কের ভূখণ্ড ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ায় ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের ওপর খলিফার অভিভাবকত্ব নিয়ে ভারতে আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণে তুর্কি খিলাফত রক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপীয় শক্তিগুলোর আগ্রাসন থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। দুই ভাই মুহম্মদ আলি ও শওকত আলি এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন সূচিত হয়। শেঠ ছোটোনী নামীয় এক ধনী ব্যবসায়ীকে এ কমিটির সভাপতি ও মাওলানা শওকত আলিকে সম্পাদক করা হয়। ১৯২০ সালে আলি ভ্রাতৃদ্বয় খিলাফত ইশতেহার ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি তুরস্কের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়তা দান এবং দেশে খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য একটি তহবিল গঠন করে। এ অঞ্চলের মুসলমানরা উসমানি খিলাফত তথা তুরস্কের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুরস্কে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য ২৬ ডিসেম্বর ১৯২১ থেকে ৯ আগস্ট ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ৭,৮১,৫৭০ তার্কিশ লিরা পাঠায়, যা দিয়ে তুরস্কে ‘ইশ ব্যাংক’ নামক একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক মুসলিম নারীরা সে সময় তাদের ব্যবহৃত গহনা তুরস্কে পাঠানোর জন্য খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে এ অঞ্চলে তাদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মুদ্রাও প্রকাশিত হয়।

এসময়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯১৯ সালের এপ্রিলে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এবং ১৯১৯ সালের রাওলাট অ্যাক্টকে সরকারি নির্যাতনের প্রমাণরূপে চিহ্নিত করে এর প্রতিবাদে অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ‘সত্যগ্রহ’ শুরু করেন। তার আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য গান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সদস্য হন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে খিলাফত আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর সমর্থনের বিনিময়ে খিলাফত নেতৃবৃন্দ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ করেন।



এভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তোলে। তবে ১৯২০ সালে ১৮ হাজার মুসলিম কৃষকের অঞ্চল ত্যাগ, ১৯২১ সালে দক্ষিণ ভারতে মোপলা বিদ্রোহ, ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মধ্যপ্রদেশের চৌরি-চৌরাতে উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক একটি থানাতে আগুন লাগানো এবং তাতে ২২জন পুলিশের মৃত্যুর ঘটনার পরপরই গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কে শক্তিশালী সেক্যুলার রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলে এই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। মোস্তফা কামালের কউর সেক্যুলার আন্দোলন, গ্রিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তার বিজয়, ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে সালতানাতের বিলুপ্তি, ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্কের প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটলে ১৯২৪ সালে এ অঞ্চলে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

### প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের বাস্তবতা

আগেই উল্লেখ করেছি, ৬৩৬ বছরের গৌরবজ্জ্বল উসমানি খিলাফত ১৯২৪ সালে আতাতুর্কের হাত দিয়ে বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যে খিলাফত দুনিয়ার তিন মহাদেশকে সুন্দরভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে শাসন করেছে, তাদের অভ্যন্তরে স্বয়ং সুলতান কর্তৃক সংস্কার আন্দোলন কতটুকু প্রয়োজন ছিল? এই সংস্কার কেন ব্যর্থ হয়েছিল? কিংবা জনগণের একাংশ গৌরবের এই খিলাফতের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী চিন্তার আলোকে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল কেন? নিঃসন্দেহে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক কিংবা আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথমত, খিলাফতে দীর্ঘ সময় যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তরাধিকার নির্বাচিত হওয়ার পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক নিয়মে অযোগ্য খলিফা মনোনীত হওয়ার কারণে খিলাফত তার আদর্শের জায়গা থেকে কিছুটা সরে আসায় সমগ্র দুনিয়ায় তাদের বিজয় অভিযান মুখ থুবড়ে পড়েছিল। ১৫৬৬ সালে সুলতান সুলাইমানের মৃত্যুর পর গতানুগতিক ধারায় চলমান খিলাফত আধুনিক সমরাস্ত্র, অর্থনীতি ও শিক্ষায় পিছিয়ে পরায় ১৭৮৯ সালে অনেকটা বাধ্য হয়ে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিল।

দ্বিতীয়ত, ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ উসমানি খিলাফতের জনগণ ও শাসক উভয় শ্রেণিকে আকৃষ্ট করে। পাশাপাশি পাশ্চাত্যের জ্ঞানের মূল স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত এনলাইটমেন্ট-এর বিকাশ খিলাফতের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মানসিক পরিবর্তন করে ফেলে। ফলে স্বয়ং শাসকশ্রেণি ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণদের রাজনীতি, কূটনীতি, সমরনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসায় এক্সপার্ট হয়ে খিলাফতে ভূমিকা রাখার জন্য ইউরোপে পাঠায়।

তৃতীয়ত, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা গ্রহণকারী এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এক পর্যায়ে উন্নয়নের নামে খিলাফতবিমুখ হয়ে পড়ে এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সহযোগিতায় প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের দাবিতে সংবিধান প্রণয়ন এবং অন্যান্য কাজ এগিয়ে নিয়ে এক পর্যায়ে সুলতানদের তাদের অনেকটা পুতুলে পরিণত করে।

## আতাতুর্কের একদলীয় শাসনব্যবস্থা

### একমাত্র রাজনৈতিক দল সিএইচপির যাত্রা

১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আতাতুর্কের নেতৃত্বে সিএইচপি (জুমহিরিয়াত হাঞ্চ পার্টিসি) বা তর্কিশ রিপাবলিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কামালিজম ও সামাজিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলটি ১৯৬৫ সালের পর নিজেদের বামপন্থী হিসেবে পরিচিত করে তোলে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত তুরস্কের একমাত্র দল হিসেবে তারা ক্ষমতায় ছিল এবং সেখানে অন্য কোনো দল গঠন নিষিদ্ধ ছিল। শাসন বিভাগে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সকলেই ছিল সিএইচপির লোকজন। দলের প্রাদেশিক সভাপতি হতেন উক্ত প্রদেশের গভর্নর, জেলা সভাপতি হতো জেলা প্রশাসক। এভাবেই সকল পর্যায়ে সিএইচপির লোকেরা এককভাবে দায়িত্ব পালন করত।

দলটির নেতৃত্বে ছিল যথাক্রমে ১৯২৩-৩৮ পর্যন্ত কামাল আতাতুর্ক, ১৯৩৮-১৯৭২ পর্যন্ত ইসমত ইনু, ১৯৭২-১৯৮০ বুলেন্ট এজভিত, ১৯৯২-২০১০ দেনিজ বাইকাল এবং ২০১০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত কামাল কিলিসদাউলু। ১৯৮০ সালের সামরিক ক্যু'র পর তুরস্কে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হলে সিএইচপির অনুসারীরা তিনটি দল (পপুলিস্ট পার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্রেসি পার্টি ও বাম পার্টি) গঠন করে।

### আতাতুর্কের সংস্কারসমূহ

আতাতুর্ক ক্ষমতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েই তার আসল চেহারা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তুমুল জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে উসমানি সালতানাতের নাম-নিশানা মুছে দেওয়ার আয়োজন শুরু হলো। মুসলিম জাতিসত্তাকেও মুছে দিতে চাইলেন। আতাতুর্ক নতুন তুরস্ক গঠনের নামে কিছু সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেন।

**রাজনৈতিক সংস্কার :** উসমানি খিলাফতের ধর্মীয় চেতনা ও ঐতিহ্য দূর করার উদ্দেশ্যে আতাতুর্ক বেশ কিছু মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন করেন। উসমানি আমলের দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থার এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদ চালু করে। উসমানি আমলের ধর্মীয় সম্প্রদায় মিল্লাত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের নেতৃত্ব নির্বাচন করত, কামাল আতাতুর্ক তা বাতিল করে ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ তথা সিএইচপির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ১৯৩০ সালে স্থানীয় নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার এবং ১৯৩৪ সালে জাতীয় নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। ফলে ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ১৮ জন নারী নির্বাচিত হয়।

**সামাজিক সংস্কার :** উসমানি সামাজিক ব্যবস্থার ধর্মীয় প্রভাব দূর করার নিমিত্তে ১৯২৫ সালে সকল ধর্মীয় পোশাক নিষিদ্ধ করে আধুনিক পোশাক পরিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়। হ্যাটল পরিবর্তন করে পাগড়ির বদলে হ্যাটক্যাপ পরিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়। ওলামাদের ঝাড়-ফুক নিষিদ্ধ করে ডাক্তারদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। বহুবিবাহ লোপ, নারীদের ডিভোর্স দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯২৯ সালে তুরস্কে প্রথমবারের মতো সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯৩০ সালে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য তুরস্কের প্রতিনিধি রিও ডি জেনিরোতে পাঠানো হয়।

**ধর্মীয় সংস্কার :** তুরস্কের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার পদ বিলোপ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, সকল মজুব ও মাদ্রাসাকে বিলোপ সাধন করে সাধারণ শিক্ষার অধিনে নেওয়া হয়। ১৯২৬ সালে ইসলামি ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে ইউরোপীয় ক্যালেন্ডার চালু করা হয়। সরকারি-বেসরকারি ভবনের সম্মুখে সকল ধর্মীয় বাণী মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে রাষ্ট্র ধর্ম থেকে ইসলামকে বাদ দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার ইসলামি আইন-কানুন বাতিল করা হয়। ১৯২৮ সালের ১ নভেম্বর আরবি হরফের পরিবর্তে তুর্কি হরফ চালু করা হয়। ১৯৩২ সালে তুর্কি ভাষায় কুরআন অনুবাদ করা হয়। ১৯৩৩ সালে মসজিদসমূহে তুর্কি ভাষায় আজান ও নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার করা হয়। সকল প্রকার এলকোহল মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আতাতুর্কেও বিভিন্ন সংস্কারের মধ্য সবচেয়ে আলোচিত ছিল আরবি ভাষায় কুরআন, আজান ও নামাজ নিষিদ্ধকরণ। তুরস্কের সাধারণ জনগন মেনে নিতে না পারলেও সরকারি বাহিনীর ভয়ে চুপ থাকতে বাধ্য ছিলেন।

**শিক্ষা সংস্কার :** তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করতে বিবাহমান সকল শিক্ষাব্যবস্থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে নিয়ে আসা হয়। সুইস অধ্যাপক ডক্টর ম্যালশের নেতৃত্বে তুরস্কের উচ্চ শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা অনুষদ এবং ২০ জন বিদেশি প্রফেসর নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালে তুর্কি এথলেটদের প্যারাসুটিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য রাশিয়া থেকে প্রশিক্ষক আনা হয়। প্রচুর পরিমাণে নতুন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং শিক্ষকদের সিএইচপির মতো রাজনৈতিক দলের প্রচারণায় অংশ নিতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

### বিরোধীদের যাত্রা ও বিলুপ্তি

১৯২৪ সালে আতাতুর্কের কিছু অনুসারী কাজিম কারাবেকির, আলি ফুয়াদ ও রাউফ উরবায় 'প্রোগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টি' গঠন করে। কিন্তু ১৯২৫ সালের ৫ জুন আতাতুর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশঙ্কা ও হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। দলটির প্রতিষ্ঠাতাদের মার্শাল কোর্টে বিচার করা হয়। আতাতুর্কের অপর বন্ধু দলটির সহ-সভাপতি এবং ফ্রান্সের সাবেক

রাষ্ট্রদূত আলি ফেতিহ ওকারার আতাতুর্কের পরামর্শে ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রজাতন্ত্র মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত রেখে ১৯৩০ সালের ১২ আগস্ট ‘লিবারেল পার্টি’ বা ‘সারবেস্ট ফিরকা পার্টি’ গঠন করেন। কিন্তু অল্প সময়ে দলটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, ইজমির সমাবেশে সরকার বিরোধী শ্লোগান, স্থানীয় পৌর নির্বাচনে ৩০টি পৌরসভায় জয় পাওয়া এবং স্থানীয় নির্বাচনে সিএইচপি কর্তৃক ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে সমালোচনা করার কারণে ১৯৩০ সালের ১৬ নভেম্বর মাত্র তিন মাস ছাব্বিস দিনের মাথায় দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তুরস্কে আর কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

### কামালিজম যখন মতবাদ

১৯৩০ সালে কামালিজমকে একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে পরিণত করা হয়। আতাতুর্কের রাষ্ট্র ও দল পরিচালনার নীতিসমূহ এবং সংস্কারকে কামালিজমের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রজাতন্ত্রবাদ (Republicanism), জাতীয়তাবাদ (Nationalism), ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism), গণবাদ (Populism), রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদ (Statism) এবং বিপ্লববাদকে (Revolutionism) ১৯৩১ সালে পার্টির বুলেটিনে প্রথম ছাপানো হয়, যা মূলত কামালিজম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

### কুর্দিস নেতাদের ফাঁসি

উসমানি খিলাফতের দীর্ঘ সময়ে কুর্দি সমস্যা দেখা যায়নি। কিন্তু স্বাধীন তুরস্কের শুরুতেই আতাতুর্কের কটর জাতীয়তাবাদী তর্কিশ জাতি গঠনের ধারাবাহিকতায় ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুর্দিশ নেতা শেখ সাইদের নেতৃত্বে প্রায় পনেরো হাজার বিদ্রোহী স্বাধীন কুর্দিস্থানের দাবিতে দিয়ারবাকির এবং মার্দিন প্রদেশ দখল করে নেয়। তর্কিশ সেনাবাহিনী তা শক্ত হাতে দমন করে ১৯২৫ সালের ২৯ জুন শেখ সাইদ এবং তাঁর অনুসারীদের ফাঁসিতে দেয়। ১৯২৭ সালে শেখ সাইদের ছোটো ভাই শেখ আব্দুর রহমান তুরস্কের গ্যারিসন, মালাতিয়া, বেঙ্গল এবং এরজুরুম প্রদেশ দখল করে নিলে ১৯২৯ সালের মধ্য তুরস্কের সেনাবাহিনী তাদের পুরোপুরি দমন করেন।

১৯২৭ সালে জেনারেল ইহসান নুরি পাশার নেতৃত্বে আয়ারি প্রদেশে বিদ্রোহ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে এই বিদ্রোহ চলার পর ১৯৩১ সালে তর্কিশ সেনাবাহিনী তা দমন করে। তুরস্কের সরকারের সবচেয়ে ভয়ংকর অভিযান ছিল ১৯৩৯ সালে তুরস্কের তুনজেলি প্রদেশে। এই অভিযানে বিমান হামলায় প্রায় চোদ্দো হাজার বিদ্রোহী এবং সাধারণ জনতা নিহত হয়। আতাতুর্কের পালিত কন্যা সাবিহা গোকচেন এই হামলার নেতৃত্ব দেন।

### আতাতুর্কের একদলীয় শাসনামলের পররাষ্ট্রনীতি

সুবিশাল উসমানি খিলাফতে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের তুলনায় স্বাধীন ক্ষুদ্র তুরস্কে বিদেশি হস্তক্ষেপ অনেক কম ছিল। লুজান চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত আতাতুর্ক সাহসীকতার পরিচয় দিলেও তার উত্তরসূরীরা সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি।

**তুরস্ক-গ্রিস সম্পর্ক :** তুরস্কে অবস্থানরত গ্রিক খ্রিষ্টানদের গ্রিসে প্রত্যাবর্তন এবং গ্রিসে অবস্থানরত তার্কিসদের তুরস্কে ফেরত আনতে ১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়াও দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির পর উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীরা আংকারা এবং এথেন্স ভ্রমণ করে। এ ছাড়া দুই দেশের সীমানা সংক্রান্ত সমস্যাগুলোও সমাধান করা হয়।

**তুরস্ক-ফ্রান্স সম্পর্ক :** আলেকজান্দ্রিয়া বর্তমানে তুরস্কের হাতাই প্রদেশ নামে পরিচিত। ১৯২১ সালের ফ্রান্স-বউলন চুক্তি অনুযায়ী আলেকজান্দ্রিয়ায় ৪০% ফ্রান্স-তুরস্ক বিশেষ শাসনব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্স আলেকজান্দ্রিয়াসহ সিরিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিলে ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক পুনরায় খারাপ হয়। ১৯৩৮ সালের ৩ জুলাই আলেকজান্দ্রিয়ায় ফ্রান্স-তুরস্ক যৌথ সৈন্য মোতায়েন হয় এবং ভবিষ্যতে গণভোটের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলেকজান্দ্রিয়া বা হাতাই নিয়ে বিশেষ গণভোটে তুরস্কের পক্ষে বেশির ভাগ ভোট পড়ায় তা তুরস্কের অধীনে চলে আসে। ১৯৩৯ সালের ২৩ জুন তুরস্ক-ফ্রান্স এক অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স তুরস্ককে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। তুরস্ক নিজেরাও এসময় বিদেশি শক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষায় কাজ করেছিল।

**তুরস্ক-রাশিয়ার সম্পর্ক :** ১৯২৫ সালে তুরস্ক-রাশিয়া দশ বছরের মৈত্রী চুক্তি করে এবং ১৯৩৫ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি শিল্প পরিকল্পনা করে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তুরস্কের পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের ফলে সম্পর্ক কিছুটা শীতল হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী ইসমত ইনু সেই সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। তবে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাথে ১৫ বছর মেয়াদি চুক্তির ফলে রাশিয়া যথেষ্ট মনঃস্ফূর্ণ হয়। ১৯২৫ সাল থেকে চলে আসা রাশিয়া-তুরস্ক মৈত্রী চুক্তি ১৯৪৫ সালে মেয়াদ শেষ হলে তা আর নবায়ন হয়নি। ১৯৪৬ সালে রাশিয়া তুরস্কের ‘মনট্রেক্স স্ট্রেইটস কনভেনশন’ সংশোধনের দাবি জানায়, কিন্তু তুরস্ক তা প্রত্যাখ্যান করে। এই দাবির মাধ্যমে রাশিয়া তুরস্কের প্রণালীগুলোর যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরক্ষার দাবি করেছিল। ১৯৪৬ সালে তুরস্কের কমিউনিস্টপন্থী ৭০ নেতাকর্মী গ্রেফতার হলে রাশিয়া-তুরস্ক সম্পর্ক আরও নিম্নগামী হয় এবং ১৯৪৭ সালে এই সম্পর্ক সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছে যায়।

**তুরস্ক-ইংল্যান্ড সম্পর্ক :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের তুরস্কবিরোধী ভূমিকা, ১৯১৯ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রিসকে সমর্থন, তুরস্কে অবস্থানরত সংখ্যালঘু কুর্দিসদের পক্ষাবলম্বন, ব্রিটিশদের সহায়তায়

আরব অঞ্চলের বিদ্রোহ, আর্মেনিয়াদের সমর্থন, ইস্তান্বুলে ব্রিটিশ সৈন্যের দখলদারিত্ব, মসুল নিয়ে উভয় দেশের মতানৈক্যসহ অনেকগুলো ইস্যুতে দুই দেশের পররাষ্ট্রবিষয়ক সম্পর্ক ভালো ছিল না। ১৯২৬ সালের ৫ জুন ব্রিটেন-তুরস্কের মধ্য সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক মসুলের দাবি পরিত্যাগ করে এবং ব্রিটেন মসুলের ১০% তৈল তুরস্ককে প্রদান করতে রাজি হয়। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ রণতরী ইস্তান্বুলে শুভেচ্ছাসফর করলে উভয় দেশের শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপ নেয়। ইংল্যান্ডের রাজা ৬ষ্ঠ জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ইসমত ইনু যোগ দেন। ১৯৩৮ সালের ২৭ মে ব্রিটেন-তুরস্ক তিনটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তুরস্ককে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় এবং তুরস্কের সাথে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালিয়ে চায়। ১৯৪৩ সালে তুরস্ক মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ এবং তুরস্কের বিমানঘাটি ব্যবহারের অনুমতির ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করলেও জার্মানির বিমান হামলার আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো পক্ষেই অবস্থান নেয়নি।

**তুরস্ক-জার্মান সম্পর্ক :** উসমানি খিলাফতের শেষ সময় হতেই জার্মান-তুরস্কের অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেক ভালো ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর পরস্পরের মাঝে কিছু অভিযোগ, পালটা অভিযোগ থাকলেও তা সম্পর্কে ছেঁদ ধরায়নি। প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের যাত্রা শুরুর পর মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের আহ্বানে অনেক জার্মান অধ্যাপক, ডাক্তার, নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন সেक्टरের বিশেষজ্ঞরা এসে তুরস্ক গঠনে কাজ করে। ১৯৩০ সালে জার্মান-তুরস্কের পণ্য বিনিময় চুক্তির ফলে তুরস্কের কিছু পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে বেশি মূল্যে জার্মানিতে বিক্রি করত। জার্মান-তুরস্কের এই সম্পর্ক হিটলার ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত যথাযথভাবে চলতে থাকে। কিন্তু বলকান অঞ্চলে ইতালির আগ্রাসী নীতির প্রতি জার্মানির সমর্থন এবং ব্রিটেন-ফ্রান্সের সাথে তুরস্কের মিত্রতার ফলে সম্পর্কে কিছুটা ফাটল ধরে।

১৯৩৯ সালে হিটলার ফ্রাঞ্জভোন পাপেনকে রাষ্ট্রদূত করে তুরস্কে পাঠান। ফ্রাঞ্জভোন পাপেন ১৯৩৯-১৯৪০ সালে তুরস্ককে ব্রিটেন-ফ্রান্সের মৈত্রী হতে বিরত রাখার ব্যাপারে কাজ করে, ১৯৪১-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত উভয় দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কাজ করে এবং ১৯৪৪ সালে তুরস্ককে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে কাজ করে। ১৯৪১ সালে জার্মান-তুরস্কের মধ্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে জার্মান-তুরস্কের মধ্য দিয়ে আরব অঞ্চলের দেশগুলোতে পণ্যের পাশাপাশি গোপনে যুদ্ধসামগ্রী ও সৈন্য পাঠাত। তুরস্ক এসময় অধিক মূল্যে জার্মানিতে ইস্পাত তৈরির উপাদান ক্রোম রপ্তানি করত। ১৯৪২ সালের পর জার্মান সেনাবাহিনী বিশ্বব্যাপী দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৪৪ সালের ২০ এপ্রিল তুরস্ক ক্রোম রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। ১৫ জুন তুরস্কের প্রণালী দিয়ে জার্মান নৌ চলাচল বন্ধ করে দেয়। অতঃপর ১৯৪৪ সালের ২ আগস্ট জার্মান-তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

### আতাতুর্ক-ইনুন্নর দ্বন্দ্ব

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আতাতুর্ক এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইসমত ইনুন্ন দায়িত্ব পালন করে এসেছে। কিন্তু আতাতুর্কের শারীরিক অবস্থার অবনতির দরুন তিনি দল ও দেশের মূল কাজগুলো ইসমত ইনুন্নর হাতে অর্পণ করেন। কিন্তু ইনুন্ন ধারাবাহিকভাবে আতাতুর্কের পরামর্শকে অমান্য করায় দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক পর্যায়ে ১৯৩৭ সালে ইসমত ইনুন্ন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইসমত ইনুন্নর পরিবর্তে জেলাল বেয়ারকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়।

### আতাতুর্কের ইন্তেকাল

আতাতুর্ক তার জীবনের শেষ সময়গুলোতে রাষ্ট্রীয় কাজের পরিবর্তে গল্প-গুজব ও আড্ডা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৩৭ সালে আতাতুর্ক হার্টের রোগে আক্রান্ত হন। সেইসঙ্গে অস্বাভাবিক পরিমাণে মদ্যপানের কারণে তার শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলে যায়। ১৯৩৮ সালে পরিস্থিতি আরও খারাপ আকার ধারণ করলে তিনি আড়ালে চলে যান এবং জীবদ্দশার শেষ সময়গুলো ইস্তান্বুলের দলমা বাহচেলেতে কাটান। ১৯৩৮ সালের ১০ নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

### ইসমত ইনুন্নর পুনরায় ক্ষমতায়ন

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর একদিন পর ১১ নভেম্বর ১৯৩৮ সালে ইসমত ইনুন্ন সংসদ সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইসমত ইনুন্ন ছাড়াও জেলাল বেয়ার, ফেবজি চাকমাক, ফেতিহ ওয়াকইয়ার, স্পিকার আব্দুল হালিকরেনদা প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু ইসমত ইনুন্ন এবং আতাতুর্কের কাছের লোক হিসেবে পরিচিত জেলাল বেয়ার ছিল মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইসমত ইনুন্ন দীর্ঘদিন আতাতুর্কের সাথে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন। আতাতুর্কের কাছের লোকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ থাকলেও সংসদ সদস্যদের ভোট এবং সেনাবাহিনীর সমর্থনে তিনি তুরস্ক জাতির দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট এবং সিএইচপিএর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।

### দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। যুদ্ধে মিত্রশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তাভিয়াসহ বেশ কিছু রাষ্ট্র জোট বেঁধেছিল। অপরদিকে অক্ষশক্তিতে গাঁট বেঁধেছিল হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান, মুসলিনির নেতৃত্বে ইতালি, জাপান, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং পরাজয় প্রত্যক্ষ করে তুরস্কে কোনো পক্ষই অবস্থান নেয়নি। তবে তুরস্কের এই নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে দুই পক্ষই কিছুটা বিরক্ত ছিল। উভয় পক্ষের সাথে বৈরী

সম্পর্ক চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার আগেই তুরস্ক বিভিন্ন আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিল।

### আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের যাত্রা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বড়ো বড়ো স্বৈরশাসক এবং একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তনের ঢেউ তুরস্কেও এসে লাগে। তুরস্কে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে চলা অগণতান্ত্রিক একদলীয় শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। ১৯৪৪ সালে ১ নভেম্বর ইসমত ইনু সৎসদীয় গণতন্ত্র পদ্ধতির পক্ষে মত দেন এবং ১৯৪৫ সালের ১৯ মে গণতন্ত্রের বিকাশের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পরে তা বাস্তবায়ন না করায় পার্টির চার সিনিয়র নেতা— জেলাল বেয়ার ১৯৪৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে আর আদনান মেন্ডেরেস, রেফিক কোরালতান এবং ফুয়াদ কপরাঙ্ক ২৭ সেপ্টেম্বর সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১ নভেম্বর ১৯৪৫ ইনু বহুদলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনের ঘোষণা দিলে ৭ জানুয়ারি ১৯৪৬ জেলাল বেয়ার এবং আদনান মেন্ডেরেসের নেতৃত্বে ‘ডেমোক্রাটিক পার্টি’-এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তুরস্কে সর্বমোট ২৩টি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়।

### তুরস্কের রাজনীতিতে সিএইচপি'র অবস্থান

১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আতাতুর্কের নেতৃত্বে সিএইচপি (জুমহিরিয়াত হাক্ক পার্টিসি) বা তর্কিশ রিপাবলিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কামালিজম ও সামাজিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলটি ১৯৬৫ সালের পর নিজেদের বামপন্থী হিসেবে পরিচিত করে তোলে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত তুরস্কের একমাত্র দল হিসেবে তারা ক্ষমতায় ছিল, যেখানে অন্য কোনো দল গঠন ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শাসন বিভাগে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সকলেই ছিলেন সিএইচপি'র লোকজন। দলের প্রাদেশিক সভাপতি উক্ত প্রদেশে গভর্নর, জেলা সভাপতি জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। এভাবে সকল পর্যায়ে সিএইচপি'র লোকেরা এককভাবে দায়িত্ব পালন করতেন।

দলটির নেতৃত্বে যথাক্রমে ১৯২৩-৩৮ পর্যন্ত কামাল আতাতুর্ক, ১৯৩৮-১৯৭২ পর্যন্ত ইসমত ইনু, ১৯৭২-১৯৮০ বুলেন্ট এজভিত, দেনিজ বাইকাল ১৯৯২-২০১০, ২০১০-বর্তমান সময় পর্যন্ত কামাল কিলিসদাউলু। ১৯৮০ সালের সামরিক কু্য'র পর তুরস্কে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হলে সিএইচপি'র অনুসারীরা পৃথক হয়ে (পপুলিস্টপার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্রেসি পার্টি ও বাম পার্টি) তিনটি দল গঠন করে।

### বিভিন্ন নির্বাচনে সিএইচপি'র ফলাফল

১৯২৩ সাল হতে সিএইচপি তুরস্কের ক্ষমতায় থাকলেও তারা কোনো নির্বাচন ছাড়াই এককভাবে ক্ষমতায় অংশ নিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে তারা প্রথম নির্বাচন ঘোষণা করে বিভিন্ন দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেয়।



তুরস্কের রাজনীতির সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল সিএইচপি একাধিকবার ভাঙনের মুখে পড়ে। ১৯৪৬ সালে সিএইচপির দুই কেন্দ্রীয় নেতা দল থেকে আলাদা হয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করে টানা তিনবার সরকার গঠন করেছিল। ১৯৮০ সালের ক্যু'র পর সিএইচপির অনুসারীরা বিভক্ত হয়ে পপুলিস্ট পার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্রেসি পার্টি ও বাম পার্টি নামে তিনটি দল গঠন করে। তারা আলাদাভাবে সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৯৯৯ সালের নির্বাচন পর্যন্ত কমবেশি আসনে বিজয়ী হতো। ২০০২ সাল হতে সকল দল ও গ্রুপ আবারও মোটামোটি এক হয়ে কাজ শুরু করে।

### বিভিন্ন সময়ে সিএইচপির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

সিএইচপির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কামাল আতাতুর্ক। ১৯৩৮ সালে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘ আট দশকে মাত্র চারজন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

**ইসমত ইনু (১৯৩৮-১৯৭২) :** তুরস্কের কউর সেক্যুলার রাজনীতিতে কামাল আতাতুর্কের পর সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের নাম মুস্তাফা ইসমত ইনু। তুরস্কের সাবেক এই দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী ১৮৭৩ সালে ইজমিরে জন্মগ্রহণ করেন। সামরিক বাহিনীতে যোগদানের পর ১৯১০ সালে ইয়েমেনে বিদ্রোহ দমনের জন্য তাকে পাঠানো হয়। ১৯১২ সালে সেনাবাহিনীর মেজর পদে উত্তীর্ণ হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ককেশাস অঞ্চলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৯১৬ সালের ১৩ এপ্রিল মেভহিবে নামক জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি তিন সন্তানের জনক। ১৯২০ সালে কামাল আতাতুর্কের দাওয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে আনাতালিয়ার পশ্চিম ফ্রন্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তুরস্কের সাকারিয়া ফ্রন্টে অসামান্য বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে 'ইনু' উপাধী দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর তুরস্কের প্রতিনিধি হিসেবে লুজান চুক্তির কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯২৩-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ সালে আতাতুর্কের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে প্রধানমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করেন। আতাতুর্কের মৃত্যুর একদিন পর ১৯৩৮ সালে ১১ নভেম্বর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তুরস্কের রাজনীতিতে তার সবচেয়ে বড় অবদান হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ককে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। ১৯৬১ সালে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

**বুলেন্ট এজভিত (১৯৭২-১৯৮০) :** মুস্তাফা বুলেন্ট এজভিত ১৯২৪ সালের ২৮ মে ইস্তানবুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৪-২০০২ সাল পর্যন্ত মোট পাঁচ দফায় তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আংকারা ইউনিভার্সিটির আইন এবং ইতিহাস বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত লন্ডনে চাকরি করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিএইচপির পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে সোশ্যাল সাইকোলজিতে

৮ মাস পড়াশোনা করেন। ১৯৫৩ সালে সিএইচপি'র যুব শাখার কেন্দ্রীয় সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬১ এবং ৬৬ সালে পুনরায় জলদাগ জেলা থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালের সরকারে শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে ৪২ বছর বয়সে সিএইচপি'র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে ইসমত ইনুন্নুর অবসরের পর বুলেন্ট এজভিত সিএইচপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে তাঁর নেতৃত্ব সিএইচপি ৩৩.৩% ভোট পেয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে নাজমুদ্দিন এরবাকানের সাথে সরকার গঠন করেন। সরকার প্রধান থাকা অবস্থায় ১৯৭৪ সালে তুরস্ক উত্তর সাইপ্রাস বিজয় করলে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ১৯৭৭ সালের জাতীয় নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে সিএইচপি এককভাবে ৪১.৪% ভোট পেয়ে বিজয়ী হলেও এককভাবে সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৮০ সালের কু'র পর রাজনীতিতে নিষিদ্ধ বুলেন্ট এজভিত ১৯৮৭ সালে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করেন। রাজনীতিতে নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় তাঁর স্ত্রী রাহশান এজভিত ডেমোক্রটিক বাম দলের প্রধান ছিলেন। ১৯৮৭ সালে তাঁর দল মাত্র ৭ আসন পেলেও ১৯৯৫ সালে ৭৫ আসন পায়। নাজমুদ্দিন আরবাকানের সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটানোর পর বুলেন্ট এজভিত ১৯৯৭ সালে মেসুদ ইলমাজের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে তাঁর দল ১৩৬ আসনে বিজয়ী হয় এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে ২০০২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় বুলেন্ট এজভিত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২০০৬ সালের ৫ নভেম্বরে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি অনেকগুলো বইয়েরও লেখক ছিলেন। ২০১২ সালে এরদোয়ান সরকার জংগলদাক কারেয়েলমাস ইউনিভার্সিটির নাম পরিবর্তন করে তাঁর নামানুসারে 'বুলেন্ট এজভিত ইউনিভার্সিটি' নামকরণ করেন।

**দেনিজ বাইকাল (১৯৯২-২০১০) :** অ্যাডভোকেট দেনিজ বাইকাল ১৯৩৮ সালে তুরস্কের আনতালিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে আংকারা ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগ থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে পিএইচডি সম্পূর্ণ করে কয়েক বছর আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে আদনান মেন্ডেরেসের বিরুদ্ধে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৩ সালে আনতালিয়া থেকে প্রথমবারের মতো সিএইচপি'র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৭৪ সালের সরকারে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ১৯৭৮ সালের সরকারের এনার্জি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। ১৯৮০ সালের কু'র পর তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৮৭ সালে পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে সোশ্যাল ডেমোক্রটিক পার্টি থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালে তিনি দলের সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে সিএইচপি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সালের কোয়ালিশন সরকারে অল্প কিছু দিনের জন্য তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। ২০০২ সালের পর সিএইচপি তার নেতৃত্বে তুরস্কের প্রধান বিরোধীদলে পরিণত হয়। তিনি ২০০২, ২০০৭, ২০১১, ২০১৫ এবং ২০১৮ সালে তুরস্কের সবচেয়ে প্রবীণ সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

## ক্যু ও সেনা নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গুর রাজনীতি (১৯৬০-১৯৮৩)

উসমানিদের উত্তরসূরি হিসেবে চিহ্নিত ধার্মিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে, সে ব্যাপারে আতাতুর্কের অনুসারী সেনাবাহিনীর সদস্যরা সবসময় সজাগ ছিল। ১৯৬০ সাল হতে পরবর্তী চার দশকে চারটি ক্যু'র মাধ্যমে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ছিল। চার দশকে আদনান মেন্ডেরেসের ন্যায় নাজমুদ্দিন আরবাকান ও তুর্গেত ওজেলকেও অগণিত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

### তুরস্কের সেনা নিয়ন্ত্রিত সাংবিধানিক কোর্ট

সেনাবাহিনীর অধিনে ১৯৬১ সালের ৯ জুলাই তুরস্কের নতুন সংবিধান রচিত হয়। সংবিধানে মূলত ১৯২৪ সালের তুরস্কের চিন্তার প্রতিফলন ঘটানো হয়। সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক রাষ্ট্রকে তুরস্কের ভিত্তি হিসেবে যুক্ত করা হয়। প্রফেসর ইয়াবাস আবাদানের নেতৃত্বে আংকারা ইউনিভার্সিটির আইনের কয়েকজন প্রফেসরের সমন্বয়ে নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরি করা হয়। ১৯৬১ সালের ৯ জুলাই গণভোটের মাধ্যমে নতুন সংবিধান পাশ করা হয়। গণভোটে ৬১.৭% 'হ্যাঁ' এবং ৩৮.৩% 'না' ভোট পড়ে।

সেনাবাহিনীর সেক্যুলার অফিসারদের তত্ত্বাবধানে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে তুরস্কের সবচেয়ে ক্ষমতামূলক 'সাংবিধানিক কোর্ট' গঠিত হয়, যেখানে সেনাবাহিনীর অঘোষিত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাংবিধানিক কোর্ট তুরস্কের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের সকল সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত ক্ষমতা পায়। যার ফলে খুব সহজেই তারা রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়ে সকল স্তরে তাদের প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে এই সাংবিধানিক কোর্ট তুরস্কের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে। ২০১০ এবং ২০১৭ সালে এরদোয়ানের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত গণভোটের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে তাদের ক্ষমতা কমানো এবং নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়।

### সেনা সরকারের প্রধান জেনারেল জামাল গুরসেলের পরিচয়

জেনারেল গুরসেল ১৮৯৫ সালে এরজুরুমে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা তুরস্কের জানদার্মার অফিসার হিসেবে চাকরি করতেন। তুরস্কের অর্দু শহরে প্রাথমিক শিক্ষা, এরজিনজান শহরের সেনা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সিরিয়ায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৫ সালে চানাক্কালে শহরে বদলি হন।

ইসমত ইনুন্নুর নেতৃত্বে এসকিশেহির এবং শাকারিয়া পয়েন্টে যুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধ শেষে ১৯২৯ সালে ইরকানে হার্বমেকতেবি থেকে অনার্স সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫-৪৭ পর্যন্ত ইজমিরে, ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এরজিন শহরে, ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পুনরায় ইজমির সেনা ক্যান্টনমেন্টে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, ১৯৫০ মেজর জেনারেল, ১৯৫৪ সালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল, ১৯৫৬ সালে জেনারেল হিসেবে প্রমোশন পান। ১৯৫৮ সালে সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান। ২৭ মে ১৯৬০ সালের কু'র পর তিনি তুরস্কের সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### ইনুন্নুর কোয়ালিশন সরকার

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সালে সেনাবাহিনীর অধিনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সেনাবাহিনীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ইসমত ইনুন্নুর নেতৃত্বে আতাতুর্কের সিএইচপি ৩৬.৭% ভোট পেয়ে ১৭৩টি আসনে বিজয়ী হয়। আতাতুর্কের অনুসারী সেনাবাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় পুনরায় ক্ষমতায় আসে। ডেমোক্রটিক পার্টির পরিবর্তে নতুন 'আদালত পার্টি' ৩৪.৭% ভোট পেয়ে ১৫৮টি আসন লাভ করে। সেনাপ্রধান জেমাল গুরসেল সংসদ সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর হতে সেক্যুলার সিএইচপি বামফ্রন্ট গ্রহণ করে। প্রথমবারের মতো সিএইচপি এবং আদালত পার্টির সমন্বয়ে তুরস্কে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। আদনান মেন্ডেরেসের ডেমোক্রটিক পার্টির নেতৃত্বের শাস্তি কমানোর এক বিলে সিএইচপি বিরোধিতা করে। ফলে বিলটি গৃহীত হয় না। এজন্য আদালত পার্টি মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে এবং ফলে ইসমত ইনুন্কেও প্রধানমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করতে হয়। পরে ইনুন্ বাকি দলদের নিয়ে সরকার গঠন করেন, কিন্তু এরাও অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে সংবিধান সংশোধন ইস্যুতে সরকার থেকে পদত্যাগ করে। প্রেসিডেন্ট গুরসেল আদালত পার্টিকে সরকার গঠনের আহ্বান জানালে তারা সাড়া দেয় না। ফলে ইনুন্ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সমর্থনে পুনরায় সরকার গঠন করেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে সাইপ্রাস ইস্যু নিয়ে সৃষ্ট ঘটনায় ইনুন্ পুনরায় পদত্যাগ করলে তুরস্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারই পরবর্তী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করে।

### আদালত পার্টির উত্থান

আদনান মেন্ডেরেসের ডেমোক্রটিক পার্টি নিষিদ্ধের পর তুরস্কের রাজনীতিতে শূন্যতা তৈরি হয়। এই শূন্যতা পূরণ করতে ১৯৬১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আদালত পার্টির জন্ম হয়। তুরস্কের রাজনীতিতে ১৯৬১-১৯৮০ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে অবদান রেখেছে এই আদালত পার্টি। ১৯৬৫ সালের ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে সুলাইমান

দেমিরেলের নেতৃত্বে আদালত পার্টি ৫৩% ভোট এবং ২৪০টি আসন নিয়ে সরকার গঠন করে। সুলাইমান দেমিরেল প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। নির্বাচনে সিএইচপি ২৮% ভোট নিয়ে ১৩৪টি আসন লাভ করে। ১২ অক্টোবর ১৯৬৯ সালের অনুষ্ঠিত পরবর্তী নির্বাচনে সুলাইমান দেমিরেলের নেতৃত্বে আদালত পার্টি আবারও সরকার গঠন করে। নির্বাচনে আদালত পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে সুলাইমান দেমিরেল পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তুরস্কের অর্থনীতিতে এসময় চরম মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ১ মার্কিন ডলার ৯ লিরা থেকে ১৫ লিরায় উত্তীর্ণ হয়। ১৯৬৯ সালে প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন আরবাকান আদালত পার্টি থেকে বের হয়ে যান এবং কোনিয়া থেকে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে মিল্লি নিজাম পার্টি গঠন করেন।

### জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট

তুরস্কে বহুদলীয় গণতন্ত্রের যাত্রার প্রারম্ভেই ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে মিল্লোত পার্টির যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেক্যুলারিজমের বিপরীত রাজনীতির অভিযোগে ১৯৫৪ সালে আদালত কর্তৃক তা নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে তারা ‘কইলু পার্টি’-এর সাথে যুক্ত হয়ে ‘জুমহুরিয়াত কইলু মিল্লোত পার্টি’ গঠন করে, যা ১৯৬১ সালের নির্বাচনে ১৩% ভোট পেয়ে তৃতীয় দল হিসেবে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পরবর্তী নির্বাচনে তারা মাত্র ২.২% ভোট পায়। দলের এই ক্রান্তিলগ্নে যাটের কু’র প্রভাবশালী সেনা অফিসার সাইপ্রাসে জনগ্রহণকারী আলপ আরসলান তুর্কেশ পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তার নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে ‘মিল্লি হারেকতে পার্টি’ MHP গঠিত হয়। তুরস্কের রাজনীতিতে বর্তমানে তৃতীয় বৃহৎ দল হিসেবে এমএইচপি সফলভাবে রাজনীতি পরিচালনা করে আসছে। তাদের যুব সংগঠন ‘উলকু ওজাকলার’ তুরস্কের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ছাত্রদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

### দ্বিতীয় সেনা ক্যু এবং সেনা নিয়ন্ত্রিত অস্থায়ী সরকার

সোলাইমান দেমিরেল দ্বিতীয়বার এককভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর তুরস্কের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী হওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে বামপন্থী শ্রমিক ও ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। এ ছাড়াও ক্যাম্পাসগুলোতে বাম বিপ্লবী রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় হানাহানি ও খুনের রাজনীতি শুরু হয়। ডেভসুল (ডেড্রিমজি সুল বা বিপ্লবী বাম), ডেভ ইয়ুল (ডেড্রিমজি ইয়ুল বা বিপ্লবী পথ)-এর মতো বেশ কিছু বিপ্লবী বাম সংগঠন ক্যাম্পাসগুলোতে প্রতিপক্ষ ছাত্রসংগঠন ও ভিন্নমতের শিক্ষকদের ওপর হামলা এবং বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনা ঘটায়।

তাদের বিরুদ্ধে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী দলগুলোর ছাত্রসংগঠন উলকুযু অস্ত্রধারণ করে। ফলে ডানপন্থীরাও রাস্তায় নেমে আসে। সেনাবাহিনীর কিছু তরুণ অফিসারেরাও বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিডনাপিং এবং ব্যাংক ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। দেশের এই ত্রাণ্ডিলগ্নে ধারাবাহিক আন্দোলন এবং বিক্ষোভের ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে ১১ মার্চ জেনারেলদের সভা ডাকা হয়। সরকার সেনাবাহিনীর এমন কাজে হুংকার দিলেও সেনাবাহিনী তাতে কর্ণপাত না করে সুলাইমান দেমিরেলকে পদত্যাগে বাধ্য করে এবং ১৯৭১ সালের ১২ মার্চ ক্ষমতা দখল করে নেয়। পরবর্তী দুই বছর সেনাবাহিনী নিজেদেও অনুগত মধ্যবর্তীকালীন সরকার দিয়ে দেশ পরিচালনা করে। ১৯ মার্চ সিএইচপি সংসদ সদস্য নিহাত এরিমের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়।

### ইসলামপন্থীদের প্রথম কোয়ালিশন সরকার

সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৭৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তুরস্কে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আতাতুর্কের সিএইচপি ৩৩.৩%, আদালত পার্টি ২৯.৪% এবং নাজমুদ্দিন এরবাকানের মিল্লি সালামত পার্টি ১১.৮% ভোট পায়।

নির্বাচনের পর প্রাথমিকভাবে সিএইচপির সাথে কেউ কোয়ালিশন না করায় সিএইচপি প্রধান এজভিত, আদালত পার্টিকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। কিন্তু আদালত পার্টি এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। স্থানীয় নির্বাচনে সিএইচপির বিজয়ের পর রাষ্ট্রপতি পুনরায় সিএইচপিকে সরকার গঠনের আহ্বান জানালে ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে বাম আদর্শে বিশ্বাসী সিএইচপি এবং তুরস্কের ইসলামি আন্দোলন হিসেবে পরিচিত নাজমুদ্দিন আরবাকানের নেতৃত্বে মিল্লি সালামত পার্টিও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।

কিন্তু বামদের সাথে ইসলামপন্থীদের এই কোয়ালিশন কতটুকু যৌক্তিক ছিল? সে সময়ের রাজনৈতিক ক্রাইসিসের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে দেশের জন্য তারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নাজমুদ্দিন আরবাকান ক্ষমতার অংশীদার হয়ে অনেক ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে যেমন অবদান রেখেছিলেন, তেমনি তুরস্কে ইসলামের নিয়মনীতি ও সংস্কৃতির মুছে ফেলার ধারক হিসেবে চিহ্নিত সিএইচপির সাথে ইসলামপন্থীদের এই জোটের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে তাদের কিছু কাজের মাধ্যমে তারাও তাদের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে অল্প সময়ের জন্য হলেও সরে এসে তুরস্কের ধার্মিক শ্রেণির কিছুটা সমর্থন পেয়েছিল।

এজভিত প্রধানমন্ত্রী এবং নাজমুদ্দিন আরবাকান উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করেন। কিন্তু কোয়ালিশনের পর হতেই সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই দলের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ করে নাজমুদ্দিন এরবাকানের ‘এক লাখ ট্যাংক’ তৈরির কারখানাকে কেন্দ্র করে কোয়ালিশনের ভিত কেঁপে ওঠে। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর তুরস্ক সাইপ্রাস বিজয় করে।

প্রধানমন্ত্রী এজভিত সাইপ্রাস বিজয়ের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে এককভাবে সরকার গঠনের পরিকল্পনা করেন এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে পদত্যাগ করেন।

### একের পর এক কোয়ালিশন সরকার

তুরস্কে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে নয়টি অস্থায়ী ও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়, যা যেকোনো দেশের স্থিতিশীল রাজনীতির জন্য বড়ো ধরনের হুমকি। মাত্র আট মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে এজভিত-আরবাকানের সরকার ভেঙে যায়। ফলে কয়েক মাসের জন্য অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। অতঃপর ৩১ মার্চ ১৯৭৫ সালে সুলাইমান দেমিরেলের আদালত পার্টি, নাজমুদ্দিন এরবাকানের মিল্লি সালামত পার্টি এবং অন্য ছোটো দলগুলোর সমন্বয়ে আবারও কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। সরকারে সুলাইমান দেমিরেল প্রধানমন্ত্রী এবং নাজমুদ্দিন আরবাকান উপ-প্রধানমন্ত্রী হন। এই সরকার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই ১৯৭৭ সালে পুনরায় জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দেয়।

৫ জুন ১৯৭৭ সালের নির্বাচন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয়, যখন তুরস্কে চরম আকারে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সংকট বিরাজ করছিল। নির্বাচনে বুলেন্ট এজভিতের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে সিএইচপি সর্বোচ্চ ৪১.৩৯% ভোট পায়। এ ছাড়া আদালত পার্টি ৩৬.৮৯%, মিল্লি সালামত পার্টি ৮.৫৭% এবং জাতীয়তাবাদী এমএইচপি ৬.৪২% ভোট পায়।

বুলেন্ট এজভিত সরকার গঠনের উদ্যোগ নিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে তিনি ব্যর্থ হন। ফলে ২১ জুলাই ১৯৭৭ সালে পুনরায় আদালত পার্টি, মিল্লি সালামত পার্টি এবং জাতীয়তাবাদী এমএইচপি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। সুলাইমান দেমিরেল প্রধানমন্ত্রী এবং নাজমুদ্দিন এরবাকান পুনরায় উপ-প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঐক্যের অভাবে ১৯৭৮ সালে ৫ জানুয়ারি মাত্র ৬ মাসের ব্যবধানে সরকার ভেঙে যায়। ৫ জানুয়ারি ১৯৭৮ সালে এজভিত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সাথে নিয়ে পুনরায় সরকার গঠন করে। কিন্তু স্বতন্ত্র এমপিরা পদত্যাগ করলে ১৯৭৯ সালের ১২ নভেম্বর আবারও এজভিতের নেতৃত্বাধীন সরকার ভেঙে যায়। আবারও সরকার গঠনে এগিয়ে আসে সুলাইমান দেমিরেলের নেতৃত্বে আদালত পার্টি। কিন্তু এবার তারা পুরোনো বন্ধু মিল্লি সালামত, এমএইচপিকে ছাড়াই সতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিয়ে সরকার গঠন করে, যা ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

### ১৯৭৪ সাইপ্রাস অভিযান

১৯৬০ সালে গ্রিক ও তার্কিশ উভয় জাতির সমন্বয়ে স্বাধীন সাইপ্রাস গঠিত হলেও তা গ্রিক হস্তক্ষেপে বেশিরভাগ সময়ই অস্থির ছিল। ১৯৬৩, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৪ সালে সেখানে স্থানীয় মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়। ১৫ জুলাই ১৯৭৪ সালে গ্রিক সামরিক জাভা সাইপ্রাস

দখলের নিমিত্তে আক্রমণ করলে ২০ জুলাই তুরস্কের সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী পালটা আক্রমণ চালায়। ২২ জুলাই জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের সহযোগিতায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়। কিন্তু খ্রিস্ট দখলকৃত অঞ্চল এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি না দেওয়ায় ১৪ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট তিন দিনব্যাপী আরেকটি অভিযান চালিয়ে তুরস্ক বর্তমান ভূখণ্ড দখল করে। ১৯৭৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তুরস্ক সাইপ্রাসকে তাদের অধীনস্থ স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে।

### অস্থির দেশ, সেনাবাহিনীর সুযোগ গ্রহণ

মাত্র দশ বছরের মাঝে (১৯৭০-১৯৮০) তুরস্কে নয়টি সরকার গঠন, বামপন্থী বিপ্লবী সংগঠনের জন্ম, ক্যাম্পাসগুলোতে বাম- জাতীয়তাবাদীদের ধারাবাহিক সংঘর্ষ, অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার কারণে দেশের সর্বত্র এক চরম অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে। ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রসংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে হানাহানির পাশাপাশি শিক্ষকদের ওপরও হামলা ও হত্যার ঘটনা ঘটে। ১৯৭৮ সালের ৭ এপ্রিল ইস্তানবুল ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সার্ভার তানিল্লি, ১৫ জুলাই হাজিতেপে ইউনিভার্সিটির বদরুদ্দিন কমর, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ ইস্তানবুল টেকনিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর বেদরি কারাফেকিউলু এবং ২৬ নভেম্বর কারাদেনিজ টেকনিক ইউনিভার্সিটির নিজদের ড. বুলুত বাম সংগঠনের হামলায় নিহত হন।

সেনা ক্যু'র পূর্বে ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে তুরস্কে ৫৩৮৮টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১৯৭৭ সালের ১ মে ইস্তানবুলের তাকসিম স্কয়ারে শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত র্যালিতে সংঘর্ষে ৪২ জন নিহত হয়। ৯ অক্টোবর ১৯৭৮ সালে আংকারার বাহসে এভলারে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের হাতে সাত ছাত্র হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে তুরস্কের মারাসে জাতীয়তাবাদী দলের যুব সংগঠনের প্রোথ্রামে বাম সংগঠন হামলা চালালে প্রচুর হতাহত হয়। এই ঘটনা বড়ো আকার ধারণ করে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সাংবাদিক আবদি ইপেকজি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে হামলায় নিহত হয়। এভাবে প্রতিদিনই বাম ও জাতীয়তাবাদীদের হাতে হতহতের ঘটনা ঘটতে থাকে। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনী রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার অজুহাতে ক্ষমতা দখলের পায়তারা করতে থাকে।

### ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০-এর ক্যু

তুরস্কে চলমান অস্থিরতার মাঝে ১৯৭৯ সালের জুন মাসে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান নুরিগুদেস প্রধানমন্ত্রী এজভিতকে সম্ভাব্য ক্যু'র ব্যাপারে সতর্ক করে। কুদুসকে ইজরাইলের রাজধানী ঘোষণার প্রতিবাদে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকানের নেতৃত্বে মিল্লি সালামত পার্টি কোনিয়া শহরে লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে এক খলিফা, এক দেশ, এক জাতি সংক্রান্ত তুরস্কের সেক্যুলার সংবিধানবিরোধী ইসলামপন্থী স্লোগান এবং



শরিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বক্তব্যের অভিযোগ আনা হয়। ইসলামপন্থী মিল্লি সালামত পার্টির এই সমাবেশকে ইস্যু বানিয়ে ছয় দিন পর ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালের রাত তিনটায় সেনাবাহিনী রাস্তায় বের হয়। রাত ৪.৩০ মিনিটে সেনাপ্রধান কেনান এভরানের নেতৃত্বে সরকারি রেডিওতে সামরিক শাসন জারির ঘোষণা দেওয়া হয়। সংসদ বিলুপ্তি, রাজনৈতিক দল ও শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিষিদ্ধ, সিটি মেয়রদের ক্ষমতা কেঁড়ে নেওয়া, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদকে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নেওয়াসহ ১৯২৪ সাল থেকে চলমান জুমহুরিয়াত পত্রিকা বন্ধ কওে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে সকল মিডিয়া, ব্যবসায়িক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ক্ষমতা সেনা অফিসারদের হাতে কুক্ষিগত করা হয়।

সুলাইমান দেমিরেল, বুলেন্ট এজভিত, নাজমুদ্দিন এরবাকান এবং তুর্কেসকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। অক্টোবরে দেমিরেল ও এজভিতকে মুক্তি দেওয়া হলেও নাজমুদ্দিন এরবাকান এবং তুর্কেসকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। তবে সকল শীর্ষ নেতারা দীর্ঘ সময় ধরে তুরস্কের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ থাকেন। ক্যু'র এক সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল কেনান এভরানকে প্রেসিডেন্ট এবং অবসরপ্রাপ্ত বুলেন্ট উলুসুকে প্রধানমন্ত্রী করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর এবং সাবেক আমলাদের নিয়ে গঠিত এই মন্ত্রীসভায় তুর্গেত ওজেলকে উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

### গ্রেফতার ও নির্যাতন

দেশজুড়ে শুরু হয় গণগ্রেফতার। ক্যু'র প্রথম ছয় সপ্তাহে ১১৫০০ জন গ্রেফতার হয়, যা বছর শেষে ৩০০০০-এ দাঁড়ায়। পরবর্তী এক বছরে ১২২৬০০ জনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরেও ৮০০০০ রাজনৈতিক ব্যক্তি কারাগারে ছিল। সেখান থেকে ৩০০০০ জনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এই বিচারে আতাতুর্কের সিএইচপি প্রাথমিক সুবিধা পেলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বুলেস্ত এজভিতসহ তাদের কিছু নেতাকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে নাজমুদ্দিন এরবাকানের মিল্লি সালামত পার্টি, জাতীয়তাবাদী এমএইচপি, বাম সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও পিকেকের নেতাকর্মীদের সেনা সরকারের তত্ত্বাবধানে বিচার করা হয় এবং তিন হাজার ছয়শত জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়, যা পরবর্তী সময়ে কমিয়ে চূড়ান্তভাবে ২০ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। এ ছাড়াও রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়া হয়। বাম সংগঠনসমূহের সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রায় ৯০% দমন করা হয়। জাতীয়তাবাদী উলকুজুদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষা কমিশনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। তিন শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়। সেইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। ক্রমেই নির্যাতন বাড়তে থাকলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তাদের সমালোচনার মুখে কতিপয় পুলিশ ও সেনা অফিসারদের নামমাত্র বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

### জেনারেল কেনান এভরেন

১৯৮০ সালের ক্যু'র মূল হোতা জেনারেল কেনান এভরেন ১৯১৭ সালে তুরস্কের মানিসা প্রদেশের আলাসেহির জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে ১৯৮০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ক্যু সংগঠিত হয়। ১৯৮২ সালের ৯ নভেম্বর তিনি তুরস্কের সপ্তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে যে সংবিধান গঠিত হয়, তার মাধ্যমে তুরস্করাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেইসঙ্গে তুরস্কে কয়েক দশকের জন্য আবারও আতাতুর্কের চিন্তাধারা শক্তিশালী হয়ে উঠে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্যভুক্তি ইস্যু এবং আধুনিক তুরস্ক গঠনের প্রেক্ষাপটে সেগুলোকে গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করছে।

১৯৮৯ সালে তুর্গেত ওজেল প্রেসিডেন্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এই ক্যু'র কারণে তুরস্কের নিম্ন আদালত ২০১৪ সালে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। কিন্তু উচ্চ আদালতে মামলাটি অপেক্ষমাণ থাকা অবস্থায় তিনি ২০১৫ সালের ৯ মে ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাই মামলাটি আর সামনে এগোয়নি।

### গণভোট ও সাংবিধানিক সংস্কার

তুরস্কে দীর্ঘ সময় ধরে চলমান রাজনৈতিক সন্ত্রাসে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। নতুন রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল এভরেন রাজনৈতিক দলগুলোর এই ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই বিশৃঙ্খলা নির্মূলে মনোযোগ দেন। তার এই সফল তৎপরতার কারণে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণ জনগণের সাময়িক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হন। সামরিক বাহিনী দেশের রাজনীতিকে নতুন ধারায় নেওয়ার জন্য ১৯৬০-৬১ সালের কার্যক্রমের ন্যায় ১৯৮১ সালেও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে নতুন এক পার্লামেন্ট গঠন করে। ১৬০ জন সদস্যের এই পার্লামেন্টে ১২০ জনই ছিল সামরিক অফিসার। বাকিরা ছিল কিছু আমলা এবং সাধারণ জনগণ থেকে মনোনীত। নতুন পার্লামেন্ট প্রফেসর ওরহান আলদিকাচতিকে প্রধান করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সাংবিধানিক কমিটি ঘোষণা করে। ১৯৮২ সালের ৭ জুলাই সাংবিধানিক কমিটি তাদের সংবিধানের প্রথম খসড়া প্রণয়ন করে। নতুন সংবিধানে প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় নিরাপত্তা কমিটিকে অনেক বেশি ক্ষমতা প্রদান করে। সেইসঙ্গে এই সংবিধানের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মিডিয়ার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কার্যক্রম, শ্রমিক অধিকারসহ জনগণের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার সংকোচিত করা হয়। আতাতুর্কের প্রদর্শিত সেক্যুলারিজমকে আরও সুসংহত করতে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি নেওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়।